দুর্গোৎসব-পঞ্চক

অথবা

ভক্তিসুধালহরী।

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি

বিরচিত।

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

প্রকাশিত।

১৮১৭ শক।

দুর্গোৎসব-পঞ্চক

অথবা

ভক্তিসুধালহরী।

প্রথম তরঙ্গ।

প্রথম উচ্ছাস।

তারাপদের দুর্গোৎসব চিন্তা।

পাবনার অধীন দুর্গাপুরগ্রামে তারাপদ ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করেন। তারাপদ বিশেষ কোন উপাধিমান্ পণ্ডিত নহেন, কিন্তু তাহা হইলেও, ইদানীন্তন উপাধিধারী পণ্ডিতগণ হইতে কোন অংশেও ন্যূন নহেন। ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং ব্রহ্মবিদ্যাদি শাস্ত্রে তারাপদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে, তথাপি সাঙ্গোপাঙ্গ অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত হয় নাই বলিয়া তিনি উপাধি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি সমস্তই পদ্মা নদীর উদরসাৎ হইয়া গিয়াছে, নিজেও অবিধিমতে অর্থোপার্জ্জনে নিতান্তই অসমর্থ, সুতরাং সাংসারিকী অবস্থা

অতিশয় দুঃখাবহা। প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ পাঁচ ঘর দরিদ্র ব্রাহ্মণ যজমান আছেন, তাহাই তারাপদের একমাত্র জীবিকা। পুত্র, কন্যা এবং সহধর্ম্মিণী সহ পরিবারবর্গ ও চারিটি, সুতরাং সকল দিন সকলের পর্য্যাপ্ত উদর-পূর্ত্তিরও কৃচ্ছ্রতা হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি সেই দৈন্য তারাপদের হৃদয় আয়ত্ত করিতে পারে না। অনেক দিনের সঞ্চিত একটি আশা ছিল, তাহার আনুকূল্যে কোন উপায় হইতেছে না বলিয়াই তারা পদ নিতান্ত বিষন্ন ভাবে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। অদ্য সেই বিষাদের নিষ্পেষণ নিতান্তই অসহনীয় হইয়াছে, তাই গুরুদেবের চরণোপান্তে তাহা নিবেদন করিতে সমুৎসুক হইয়া তারাপদ গুরুধামে উপাগমনপূর্ব্বক গুরুদেবের পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। গুরুদেবও ক্ষণমাত্র প্রিয়শিষ্য দর্শনানন্দের অনুভব করিয়া তাঁহাকে আসনপরিগ্রহের অনুমতি পূর্ব্বক কুশল প্রশ্নাদির দ্বারা সম্ভাবিত করিলেন। তারাপদ মস্তক অবনমন পূর্ব্বক শ্রীগুরুর আজ্ঞা স্বীকার করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া উত্তর দানে প্রবৃত্ত হইলেন।

তারাপদ।—ভগবন্! মঙ্গলময় চরণযুগলের স্মরণই আমার সর্ব্ববিপদের প্রবলতর অন্তরায়রূপে অবস্থিতি করিতেছে, এখন তাহার সাক্ষাৎ দর্শন স্পর্শনে আর দাসের অকুশলের সম্ভাবনা কি? তবে মনের মধ্যে একটি অভাব আছে সত্য, কিন্তু তাহাও দর্শনের দ্বারাই ইদানীং পরিপূর্ণ হইবে, এই আশায় শ্রীপদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছি।

গুরুদেব।—বৎস! মায়ের কৃপায় কোনরূপ সাংসারিক বাধাবিঘ্ন তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহা জানি-

তেছি, তথাপি বাৎসল্যের প্রেরণায় কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু বাবা! তোমার মানসিক কি অভাব আছে, তাহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিমনা হইলাম; অতএব তাহা বিজ্ঞাপিত কর।

তারাপদ।—ভগবন্! আমার সাংসারিকী অবস্থা শ্রীচরণের অবিদিতা নাই, কিন্তু তথাপি ঐ চরণপ্রসাদে দৈহিক বা পারিবারিক অনুপপত্তির নিমিত্ত আমার কোন দৈন্যই নাই, পরন্তু চিরসম্ভৃত একটি আশা যে অন্তরেই বিলীনা হইতে চলিল, ইহাই নিতান্ত বেদনাবহ হইয়াছে। ইহা এখন এত বলবান্ হইয়াছে যে, এ বৎসর ইহার পরিপূরণ না হইলে, বোধ হয় জীবন-ধারণেই অসমর্থ হইব। তাই, ব্যাকুল হইয়া চরণোপান্তে উপস্থিত হইয়াছি। শ্রীপদের নিকট অনিবেদিত নাই যে, এই শরৎকালে মায়ের সেই চতুর্ব্বর্গপ্রদ চরণ দুখানি সন্দর্শনের নিমিত্ত বহুদিন হইতেই বাসনার সঞ্চার হইয়া আসিতেছে। পিতঃ! আমি বিদিত আছি, এ দরিদ্রের ভাগ্যে তাহা সম্ভাব্য নহে, রাজরাজেশ্বরী রাজোপহারে সেবিতা মা এ দীনের কুটীরে আগমন করিবেন না, কিন্তু তথাপি সে আশা উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। প্রতি বৎসর শরৎকালাগম হইলেই সেই বাসনানল পরিদীপ্ত হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতে থাকে, আবার অনেক প্রবোধে—অনেক উপায়ে তাহাকে শান্ত করিয়া রাখি। কিন্তু এবার তাহা অতি বলবান্ হইয়াছে, এবার কোনমতেই তাহার প্রতিসংহার করিতে পারিতেছি না, তাই শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত হইয়াছি।

গুরু।—বৎস! তোমার ঈদৃশী ঐকান্তিকী বাসনা বিদিত হইয়া পরম তৃপ্তি বোধ করিলাম। মায়ের ইচ্ছা থাকিলে এ বাসনা

পরিপূর্ণা হইতেও পারে। বাস্তবিক, মায়ের পূজা-গ্রহণ সম্বন্ধে, অর্থ-সম্পত্তির যে বিশেষ কোন উপযোগিতা আছে, তাহা নহে, তাহা তুমি যে অবস্থায় আছ, তদ্দ্বারাই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। কারণ ত্রিভুবনেশ্বরী জগন্মাতার পার্থিব কিম্বা স্বর্গীয় কোনরূপ ভোগেরই অভাব হইতে পারে না; সুতরাং তদ্দ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্তা করা দুঃসাধ্য বিষয়। কিন্তু মা ভক্তের ধন, ভক্তিই মায়ের সুধাধিক উপহার, তাহা থাকিলেই তাঁহার আগমন হইতে পারে, আর ভক্তিশূন্য সুধাও মায়ের বিষবৎ পরিত্যক্ত হয়। অতএব তুমি যদি তাহার সংগ্রহ করিতে পার, তবে এই অবস্থায়ই মাকে আনিতে পারিবে, নতুবা লক্ষ লক্ষ অর্থ-সংগ্রহ হইলেও তাহা ঘটিবার নহে, অতএব তুমি ভক্তিমান্ হইয়া যথাশক্তি আয়োজন কর, তাহা হইলেই মা আসিবেন, তোমার বাসনা পরিপূর্ণা হইবে। এ বিষয়ে কয়েকটি আখ্যায়িকা বলা যাইতেছে, তাহা শুনিলেই মায়ের লীলা রহস্য তোমার সুবিদিত হইবে।

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

প্রথম উচ্ছাস।

দুর্গাশরণের দুর্গোৎসব।

বীরভূমির অন্তর্গত কালীপুর গ্রামে দুর্গাশরণ জ্ঞানার্ণব নামে একজন মহাপুরুষ বাস করিতেন। দুর্গাশরণের নাম এবং উপাধিটি সর্ব্বথাই অর্থযুক্ত হইয়াছিল। দুর্গাই তাঁহার একমাত্র শরণ একমাত্র

গতি ছিলেন, জ্ঞানগভীরতারও ইয়ত্তা করা যাইত না। দুর্গাশরণের সাংসারিকী অবস্থা শোচনীয়া হইলেও আধ্যাত্মিকী অবস্থা তাহা নহে। তাঁহার তপস্যারাধনায় কিছুমাত্র বাধা হইত না, সংসারের কোন কিছুতেই দৃক্‌পাত করিতেন না, তিনি আনন্দময়ীর ব্রহ্মানন্দেই সতত নিমগ্ন থাকিয়া জ্বলন্ত ব্রহ্মবর্চ্চসের দ্বারা ধরণীমণ্ডলের পাপান্ধকার বিদূরিত করিতেন। দুর্গাশরণের সেই তপোবন সদৃশ আশ্রমে জগন্মায়ের সমস্ত ক্রিয়া-কলাপই হইত, শারদীয় দুর্গোৎসবও হইত। ইহাই দুর্গাশরণ জ্ঞানার্ণবের সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয়।

বিগত ১৮১৪ শকে শরৎকালের সমাগমে আনন্দবিহ্বল হইয়া দুর্গাশরণ মায়ের পূজার উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতিমানির্ম্মাণ শেষ হইয়া গেল, পূজোপহারাদিও শক্ত্যনুরূপ আসাদিত হইল। এখন সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া দুর্গাশরণ মায়ের শুভাগমনের ঔৎসুক্যসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে মহালয়ার অষ্টমী তিথি অস্তমিতা হইল, অদ্য বোধননবমী, জগন্মায়ের বোধনের দিন উপস্থিত। আজি দুর্গাশরণ আনন্দোৎফুল্লহৃদয়ে স্বয়ং উপবাসী থাকিলেন। আনন্দ-হিল্লোলে ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে সমস্ত দিন অতীত হইয়া গেল। মায়ের চরণ পীযূষ-রস পান করিয়া দুর্গাশরণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই। ক্রমে-সায়ংকাল সমাগত হইল, দুর্গাশরণের প্রতিক্ষা-লতা- আশ্রয় তরু পাইল। আজি এক বৎসর পরে মায়ের, সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হইবে। দুর্গাশরণ আজি আপনি আপনাতে নাই। আজি আনন্দের তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া খেলা করিতেছেন। শশধরের উপচয়ে বারিধির মত সংক্ষুব্ধ হইতেছেন। তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়,—সর্ব্বপ্রাণ পূরিয়া

উঠিয়াছে, অণুতে অণুতে আনন্দরসে রসাল হইয়াছে, রসের শীকর বাহিরেও ছড়িয়া পড়িতেছে। এইরূপ প্রফুল্ল হইয়া দুর্গাশরণ যথা বিহিত আসনে সমাসীন হইলেন এবং বোধনক্রিয়া প্রারম্ভ করিলেন। পরে যথাসময়ে বিহিত মন্ত্র-পাঠে মায়ের আহ্বানে প্রবৃত্ত হইলেন। আহ্বানের প্রায় সমস্ত মন্ত্র পাঠ শেষ হইল, কিন্তু কেমন যেন একটু নৈরাশ্যের বায়ু আসিয়া অন্তরে প্রবেশ করিল। হৃদয় একটু শুখাইয়া উঠিল, অমনি চমকিত হইয়া দুর্গাশরণ অতি প্রযত্নে অবশিষ্ট মন্ত্র-পাঠ আরম্ভ করিলেন। সমস্ত মন্ত্র পাঠ সমাপ্ত হইল, কিন্তু আনন্দের পরিবর্ত্তে সেই নৈরাশ্য-ভাবই ক্রমে দুর্গাশরণের হৃদয় অধিকার করিল। জগন্মায়ের সমাগমচিহ্ন কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না। আবার প্রাণ খুলিয়া আপন ভাবে, আপন ভাষায় মাকে ডাকিতে লাগিলেন, নানামতে নানাভাবে কত কথা বলিলেন, মনের সমস্ত আগ্রহ, সমস্ত পিপাসা প্রবাহিত করিলেন, কিন্তু তাহাতেও সেই নৈরাশ্যবায়ুই ক্রমে স্ফীত হইয়া উঠিল। মায়ের কোনই সাড়াশব্দ পাইলেন না, আগমনের সূচনাও বুঝিলেন না। অনন্তর আরও কত কিছু করিলেন, কতকিছু বলিলেন প্রাণপণে কত ব্যগ্রতা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, তাঁহার সেই নৈরাশ্য-বায়ুই ক্রমে প্রলয় বায়ুর ন্যায় হইয়া তাঁহার সর্ব্ব প্রাণ সর্ব্বেন্দ্রিয় শুষ্ক করিয়া ফেলিল, স্ফূর্ত্তি, তেজের হরণ করিয়া সকলকেই নিষ্ক্রিয়বৎ অবস্থায় পরিণত করিল বহিঃসংজ্ঞাও বিচলিতবৎ হইল।

এইরূপ অবস্থায় কিঞ্চিৎকাল অতীত হইলে, যেন কোন এক অদৃশ্য পুরুষ তাঁহার শ্রবণের নিকটে উপনীত হইয়া অতি মৃদুভাবে

সান্ত্বনাস্বরে বলিলেন, "মায়ের প্রিয়তনয়! শান্ত হও, তোমার ভাল হউক, মা তোমার সমস্ত আহ্বান, সমস্ত কথা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এখন আবির্ভাবের পক্ষে একটি অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে।" দুর্গাশরণ তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া সচমকে নয়ন উন্মীলন করিলেন, কিন্তু আর কিছু দেখিতে পাইলেন না, কিছু শুনিলেনও না। তখন মনে মনে নানামত বিতর্ক করিতে লাগিলেন। এ কি হইল! কে আমায় এ দারুণ কথা শুনাইল? "এখন মায়ের আবির্ভাবের পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত?" কাহার হৃদয় এমত নির্দ্দয় যে, এই মুমূর্ষু প্রাণে করবালাঘাত করিল? অথবা এ কি সত্য সত্য কাহারও বাক্য না আমার মনের বিভ্রম,—ইহা কি স্বপ্নবৎ শ্রবণ? সত্য কথা হইলে ইহার বক্তা গেল কোথা? তবে কি কোন অদৃশ্য পুরুষ, মায়ের প্রেরিত কোন মহাপুরুষ? যাহাই হউক, বাস্তবিক ঘটনাটা বোধ হয় সত্যই হইবে। না হইলে এত প্রাণপণে ডাকিয়াও মায়ের আসার আশা পাইলাম না কেন? অন্য কখনও তো এরূপ ঘটনা হয় না, আহ্বান করিলেই তো মায়ের আবির্ভাবচিহ্ন অনুভূত হয়! এবার বোধ হয়, নিশ্চয়ই এই পাপভূমি মায়ের শ্রীপদ-সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইল না। হতভাগিনী ভারতভূমি! তুমি এবার পবিত্র হইতে পাইলে না। হউক, আর একবার প্রাণপণে ডাকিয়া দেখিব, তাতেও না হয়, তবে এই এক পক্ষ পর্য্যন্তই ডাকিব, প্রাণান্ত করিব, অবশেষে মাকে ভাবিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকিব কিরূপে? প্রাণ যে বুঝিতেছে না।" এই বলিয়া আবার মনের মত করিয়া মাকে ডাকিতে লাগিলেন, সমস্ত প্রাণ সমর্পণ করিয়া মায়ের উপলব্ধি নিমিত্ত অসাধারণ

প্রযত্ন করিলেন, কিন্তু কোনই সাড়া পাইলেন না, কিছু বুঝিলেনও না। তখন বুঝিলেন, কাণে কাণে যাহা শুনিয়াছেন, তাহা স্বপ্নের প্রস্ফুরণ নহে। তাহা তাঁহার দুষ্পরিণামের যথার্থ বিজ্ঞাপন বার্ত্তা। তখন সমস্ত আশা-ভরসা ছিন্নপ্রায় হইল, আনন্দের সমুদ্র শুষ্ক হইতে লাগিল, অসহ্য যাতনানল জ্বলিত হইয়া অন্তস্থলী তপ্ত করিতে লাগিল।

এইরূপ ক্লিশ্যমান হইয়া দুর্গাশরণ কেবল নিষ্ফল মন্ত্র-পাঠরূপেই বোধন-ক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন, এবং প্রাণরক্ষার অনুরোধে যৎকিঞ্চিৎ হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া শান্তির আশায় কুশশয্যায় শয়িত হইলেন। মনে নানা চিন্তা, নানা কষ্ট, সুতরাং শীঘ্র নিদ্রা হইল না। পরে অনেক যত্নে—অনেক প্রবোধে একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন, নিদ্রা-দেবীর আবির্ভাব হইল। ক্রমে তিনি দুর্গাশরণের সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণ এবং মন-বুদ্ধির সহিত আত্মাকে আয়ত্ত করিলেন। দুর্গাশরণ তখন অন্য রাজ্যে উপনীত। তখন দেখিতে পাইলেন, একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব পুরুষোত্তম মণ্ডপের অভিমুখে আসিতেছেন। পুরুষটির নব-মেঘের মত বর্ণ, চারিখানি ভুজ, তাঁহার এক করে শঙ্খ, অপর করে চক্র, অপর করে গদা, এবং করান্তরে প্রস্ফুটিত পঙ্কজ। হৃদয়ে ভৃগুমুনির পদচিহ্নে সমাশ্লিষ্ট কৌস্তুভমণি দীপ্তি পাইতেছে। গলদেশে ত্রিগুণীকৃত বন-কুসুমের মালা। কণ্ঠে শ্বেত যজ্ঞোপবীত, মস্তকে অপূর্ব্ব কিরীট, নয়নদ্বয় পঙ্কজ-পলাশ সদৃশ। পীত বসন পরিধানে, সেই নীল তনুটি, তড়িদ্‌যুক্ত মেঘের মত শোভা পাইতেছে। পুরুষটির প্রভার দ্বারা দশ দিক্‌ আলোকিত হইল, প্রসন্নভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল, বায়ুমণ্ডল মঙ্গল্য হইয়া উঠিল, পৃথিবীতে পবিত্রতার সঞ্চার

হইল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ঐ কালরূপের মধ্যেই যে আরো কত কিছু আছে, কত কোটী কোটী চাঁদ ফুটিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। ইহাঁর বাহন একটি অপূর্ব্বদৃষ্ট খগরাজ।

এইরূপ পুরুষটি ধীরে ধীরে সমাগত হইলেন। ক্রমে মণ্ডপের সন্নিহিত হইয়া বিহঙ্গরাজকে দ্বারদেশে নিয়োগ করিয়া মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। দুর্গাশরণ সেই স্বাপ্ন রাজ্যে থাকিয়াই, বিস্ময়োৎফুল্ল-হৃদয়ে গাত্রোত্থান করিলেন। পরে আসন দান ও চরণ বন্দন করিয়া হর্ষাবেগে কিয়ৎকাল জড়বৎ হইয়া রহিলেন, আর নির্নিমেষ-নেত্রে সেই রূপের মাধুরী পান করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তের পরে, দুর্গাশরণ আত্মস্থ হইলেন, তখন পুনর্ব্বার মস্তকের দ্বারা তাঁহার চরণযুগলের পাপি-পাবন রেণু গ্রহণ করিয়া করযোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন আর দুঃখানুবিদ্ধ হর্ষগদ্গদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন।

হে পুরুষোত্তম! আপনাকে প্রণাম, আপনার অগ্র, পশ্চাৎ, দক্ষিণ, বাম সর্ব্বত্র ভূরি ভূরি দণ্ডবৎ প্রণাম। ভগবন্! পাপাত্মার তৃণ-কুটীরে গোলোকমণির উদয় হইল কেন? যে নরাধম হতভাগ্য, মায়ের কৃপা-লাভেরও অযোগ্য, তাহার প্রতি কি আর কাহারও দয়া হইতে পারে? হৃষীকেশ! এখন কোন্ ধাম হইতে ঐ গঙ্গা-প্রসূতি চরণ-দুখানি পাপরাজ্যে অবতীর্ণ হইল? এবং অবতরণের কারণ কেবল এ হতভাগ্যের পাপমোচন নয় কি?

পুরুষোত্তম!—দুর্গাশরণ! তোমার মঙ্গল হউক্। তুমি মায়ের প্রিয়-তনয়, সুতরাং আমাদেরও প্রিয়। তুমি ত্রিলোকের প্রিয়। আমি এখন কৈলাসধাম হইতে আসিলাম, তোমাকে সান্ত্বনার নিমিত্ত। দ্বিজবর! তুমি জ্ঞানবান্ পাত্র, মায়ের গৌরবাদি সম-

স্তই অবগত আছ। তোমার অধীর হওয়া কর্ত্তব্য নহে। মা সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া এই পৃথিবীতে আসুন আর না আসুন, কিন্তু অভাবতো কোন থানেই নাই। মা অব্যক্তরূপে এই ত্রিলোকের অন্তর-বাহিরে বিরাজ করিতেছেন, মা সাক্ষি-স্বরূপে কীটাণু হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলের সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। যে যাহা কিছু করে, যাহা কিছু ভাবে, সমস্তই মা জানিতেছেন ; যাহা কিছু বলে, তাহাও শুনিতেছেন ; তবে এত অধৈর্য্য কেন ? মাতো হারা হইবার দ্রব্য নহেন ? মায়ের অভিব্যক্তরূপে আবির্ভাব সম্বন্ধে দুটি গুরুতর প্রতিবন্ধক উপস্থিত, তাই এবার তাহা ঘটিতেছে না ;—এবার কেন, বোধ হয়, শীঘ্রই আর জগন্মায়ের আসা হইবে না।

দুর্ভাগ্য মানবগণ, সেই ত্রিলোক-জননীর প্রতিমূর্ত্তি নিকটে রাখিয়া তাঁহার পূজার ছলে যেরূপ আচরণ করে, যে ভাবে তাঁহার পূজা করে, তাহাতে সেই সদানন্দময়ী সর্ব্বংসহার কোনরূপ বিরক্তি অনুরক্তি নাই বটে, কিন্তু মায়ের প্রিয়পুত্র দেবগণ তাহা সহ্য করিতে পারেন না। তাই বরুণ, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি অমরগণ আজি কয়েক বৎসর যাবৎ পৃথিবীর প্রতি নানারূপ পীড়ন করিতেছেন। এই যে অনাবৃষ্টি, অতি বৃষ্টি, বন্যা, বজ্রপাত, ঝঞ্ঝাবাত, অগ্নিস্তম্ভ, জলস্তম্ভ, অতীসার, জ্বর, বসন্তাদির এত উৎপাত দেখিতেছ, ইহা তাহারই ফল। কিন্তু আবার মা আসিলে, সমস্ত দেবগণও আসিবেন, পূজাও সেইরূপই দেখিবেন, ক্রুদ্ধও সেইরূপই হইবেন, কার্য্যও সেইরূপই করিবেন। এইরূপ অত্যাচারে অসাধুর সঙ্গে সঙ্গে সাধুগণও ক্লিশ্যমান হয়েন, ইহা বড় অধিক দুঃখের বিষয়

ইহাই মায়ের আসার এক প্রতিবন্ধক। ইহা গত বারেই তুমি অবগত আছ। গত বৎসরেই জগন্মাতার ধরণী-স্পর্শের কথা ছিল না, শেষে তুমি এবং তোমার মত কয়েকজন কৃতাত্মা পুরুষের ঐকান্তিক নির্ব্বন্ধে বাধ্য হইয়া অগত্যা আসিয়াছিলেন। অতএব এ বৎসর আর জগন্মায়ের আগমন হইতেছে না।

দ্বিতীয় বাধা, মহাপ্রলয়ে শৈথিল্য হওয়া। পৃথিবীর যেরূপ অবস্থা, ইহাতে ইহার সংহারই একমাত্র শান্তি। ত্রিলোক-পাবনী জগজ্জননীর শুভাগমনে তাহার বিলম্ব হইতেছে। এক-বার মায়ের চরণ স্পর্শ হইলে পৃথিবীর বহু বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মা যে দেশে শুভাগমন করেন, সেই দেশ-টীরই আধি, ব্যাধি, পাপ, তাপ, সমস্ত বিদূরিত হয়। আবার তদীয় বায়ু-সংস্পর্শে সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলই অনেক পবিত্রতা লাভ করে। সমস্ত পৃথিবীতে পাপের পূর্ণ মাত্রা না হইলে সমস্ত বিনাশ হইতে পারে না। সুতরাং সংহারের সময় সন্নিহিত হইলেও প্রতি বৎসরে মায়ের শুভাগমনে ক্রমেই তাহার বিলম্ব পড়িতেছে, অতএব মায়ের আগমন আশা করা এখন যুক্তিসঙ্গত নহে।

অবনি অতি প্রাচীনা হইয়াছেন। ইহার প্রসব-শক্তি এবং অন্যান্য ক্রিয়া-শক্তি একবারেই শিথিল হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ আবার ভারতভূমি, তাহাতে আবার বঙ্গ, রাঢ় এবং বরেন্দ্র দেশ। এই সকল ভূমি বৃদ্ধ কুক্কুটীর ন্যায় অধিকাধিক সন্তান সন্ততি প্রসব করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহারা নিতান্তই সারশূন্য হইতেছে। এদেশের মানবগুলি মল-মূত্র-পূর্ণ এক একটা মেদের পিণ্ডমাত্র। উহাদের শরীরও যেমন, মনও তেমনিই জানিবে। তাহা

বরং শরীরাপেক্ষায় অধিকতর অসার। এমন কি, এই সকল দেশে মানবগণের মধ্যে অন্তঃকরণ আছে কি না, ইহাও বিচার্য্য বিষয়। কাক শৃগালাদি অশুভাবহ প্রাণী ব্যতীত ভারতের প্রত্যেক প্রাণিজাতিরই ঐরূপ অবস্থা। ইহাই জঙ্গম প্রাণীর পক্ষে পৃথিবীর অবস্থা।

এতদ্ব্যতীত স্থাবর প্রাণীর মধ্যেও উৎপত্তির সংখ্যা এবং গুণাদি সমস্তই নষ্টপ্রায় হইয়াছে। ধান্যাদি শস্য এবং অন্যান্য বৃক্ষ লতাদি পূর্ব্বে যেরূপ হৃষ্ট, পুষ্ট ও উন্নত হইত, এখন তাহা হয় না। তৎপর শস্যের অবস্থাও অতি শোচনীয়। পূর্ব্বে যে ক্ষেত্রে যে পরিমাণ শস্য হইত, উপযুক্ত বর্ষণাদি পাইলেও এখন তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ হওয়া দুষ্কর। ইত্যাদি নানা কারণে পৃথিবীর বার্দ্ধক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব ইহাকে প্রতিসংহার করিয়া পুনর্ব্বার অভিনব সৃষ্টি করা আবশ্যক হইয়াছে। সেই জন্য অনেক দিন হইতে ইহার উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে। স্বয়ং রুদ্রদেব তাহাতে ব্রতী হইয়াছেন। মায়ের আজ্ঞামতে সমস্ত দেবগণই পৃথিবীর বিনাশের জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। ঐ দেখ, আমার বৈষ্ণব জ্বর, শৈবজ্বর, তাঁহাদের সহচর বসন্ত, এবং অতীসারী দেবী ভারতকে শ্মশান-ক্ষেত্র করিয়া কিরূপ আস্ফালন করিতেছেন ;—শ্মশানে তুলসীর পরিবর্ত্তে জামালকোঠা বসাইয়া কাক-শৃগালে সাজাইয়া কিরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। হুতাশন, অম্ল, পিত্ত ও অম্লপিত্তাদি নানাভাবে নানা নামে অবতীর্ণ হইয়া জীবিত দেহই দগ্ধ করিতেছেন। সমীরণ মানুষের দেহের মধ্যে, অপস্মার, উর্দ্ধক এবং বিচেতসাদি বিবিধ আকার, এবং বাহিরে, সম্বর্ত্ত, উপসম্বর্ত্ত, "দৌলৎ পুরী," "নোয়াখালী" ও "ঢাকাই বায়ু"

ইত্যাদি বিচিত্র নামে, বিচিত্র ভাবে আবির্ভূত হইয়া জলপ্লাবনাদির দ্বারা নানাস্থানে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। বরুণ ও দেবরাজ তাঁহার আনুকূল্যের ত্রুটি করিতেছেন না। তীক্ষ্ণরশ্মি প্রচণ্ড মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জগৎ ভস্মীভূত করার আশায় দিন দিন সন্নিহিত হইতেছেন, আবার আর একাদশজন সূর্য্যকে যেন অনুরোধ করিয়া টানিয়া আনিতেছেন। এইরূপে সকলেই মুমূর্ষুর নিকটে যমের ন্যায় পৃথিবীর বিনাশ সাধনের নিমিত্ত উৎক্রান্তিদা শক্তি লইয়া দণ্ডায়মান। কিন্তু প্রতি বৎসরে মায়ের আগমন হয় বলিয়া প্রলয়-কার্য্য শীঘ্র শেষ হইতে পারিতেছে না। মায়ের শ্রীচরণ-সংস্পর্শে ধরামণ্ডল সাধুশূন্য হইতেছে না। সাধুই পৃথিবীর প্রাণ। সাধু থাকিতে তাহার প্রলয়াশঙ্কা নাই। অথচ পূর্ব্বোক্ত নানারূপে পৃথিবীর বড়ই বিড়ম্বনা উপস্থিত। এখন ইহার মৃত্যু না হইলে সুখের আশা নাই। অতএব প্রলয় হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। তাই গতকল্য ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ আমার সহিত একত্রিত হইয়া কৈলাসে এই বিষয়ের চিন্তা করিয়াছিলেন। অনন্তর পৃথিবীতে সর্ব্বমঙ্গলার পদার্পণ না হওয়াই শুভকর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তদনুসারে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। জগন্মাতা একটু বিলম্বের পর তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। অতএব, বিদ্বৎপ্রবর! তুমি ধীর হও, স্থির হও, মদুক্ত সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া চিত্ত প্রসন্ন কর। এবার মায়ের শুভাগমনের নির্ব্বন্ধ পরিত্যাগ কর, প্রলয়-কার্য্যের অন্তরায়-দ্বার উদ্ঘাটন কর। তোমার, আমার প্রতি নিতান্ত প্রেম আছে, আমার কথায় তুমি সমাশ্বস্ত হইবে, ইহা মনে

করিয়া জগন্মাতা আমাকে পাঠাইয়াছেন। সর্ব্বেশ্বরী তোমার প্রতি প্রসন্না আছেন, এ দেহের অবসানে নিশ্চয়ই তুমি সর্ব্বমঙ্গলার অভয়প্রদ শ্রীপদ প্রাপ্ত হইবে। অতএব এখন ধৈর্য্যাবলম্বন কর, মহাপ্রলয়ের প্রতিকূলাচরণ করিও না। সত্য-যুগের সমাগম পর্য্যন্ত জগন্মাতার আগমন হইবে না। তুমি শান্ত হও, হৃদয় আশ্বস্ত কর।

দুর্গাশরণ।—(সাশ্রুনয়নে) চক্রপাণে! ভাগ্যের অভাব হইলে কি অমৃতও জীবনসহায় হয় না? অথবা সুধাংশুও তীক্ষ্ণ রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া থাকেন! ভগবন্! আপনি অভীষ্ট-দোহ' অভীষ্টের কামধেনুস্বরূপ। আপনা হইতে জীব সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু আমার ভাগ্যে কি সেই নামের গৌরবও লুক্কায়িত হইল? আপনার চরণস্পর্শ করিয়া বড় আশা করিয়াছিলাম যে, এইবার সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মোচক চরণ-দুখানির সংসর্গ করিয়া পবিত্র হইলাম, অভীষ্ট-সিদ্ধির কামধেনু নিকটে পাইয়া কৃতার্থ হইলাম, এখন নিশ্চয়ই আমার জগৎ-পাবনী মাকে পাইতে পারিব। এখন তাহার পরিবর্ত্তে আপ-নারই দ্বারা একবারে নিরাশ্বাস হইলাম! মধুসূদন! আপনি যাহা বলিলেন, সমস্তই সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু আমার প্রাণ যে তাহা মানিতেছে না! প্রাণ যে এখন মা না হইলে থাকি-তেছে না! হে মাধব! দুর্গাশরণের মন, প্রাণ, আত্মা এবং দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তেরই আশ্রয়-যষ্টি একমাত্র মা। মাকে আলম্বন করিয়াই ইহাদের অস্তিত্ব, মায়ের নিমিত্তই জীবন, মায়ের জন্যই ইহারা নিজ নিজ ক্রিয়া করিয়া থাকে। মা-ই ইহাদের কেন্দ্রস্বরূপা। ইহারা সংসার-রাজ্যে থাকিলেও, সেই

লক্ষ্যেই নিবদ্ধ থাকিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে,—যাবৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। মা না হইলে ইহারা কেহই বাঁচিতে পারে না। মা বিনা এ প্রাণের বন্ধন শ্লথ হইয়া পড়িবে, হৃদয় কেন্দ্র-ভ্রষ্ট হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইবে। আত্মা অবসন্ন হইবে, আলম্বন-শূন্য দেহও মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। অচ্যুত! আজি এক বৎসর যাবৎ মায়ের সাক্ষাৎ সন্দর্শন নাই বটে, তথাপি মন প্রাণ আলম্বন-শূন্য হয় নাই। মায়ের সন্দর্শনের আশাই এ জীবনকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছে। বৎসরান্তে মাকে পাইবে বলিয়াই সকলে জীবিত রহিয়াছে। মায়ের সেই নয়নভরা রূপ দেখিবে বলিয়াই আমার দৃক্‌শক্তি এতদিন যাবৎ নয়ন-প্রান্তে অবস্থিত আছে, নইলে সেই গত বিজয়ার দিবসেই নয়নাবাস পরিত্যাগ করিত। মায়ের সেই প্রাণভরা বচনমাধুরী পান করিবে বলিয়াই শ্রবণ-শক্তি শ্রবণ-বিবরে প্রতীক্ষা করিতেছে, হৃদয়ের সহিত আত্মাও সেই মায়ের ভাব-তরঙ্গে অবগাহনের নিমিত্তই জীবিত রহিয়াছে। এইরূপ আমার সমস্তই মায়ের প্রতীক্ষায় আত্মবান্ আছে। এখন মা না হইলে সকলেই শূন্যময় হইবে। অতএব, ভগবন্! আপনি এ দুঃখীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন্। আপনি অনুগ্রহ করিয়া মাকে আমার অবস্থা অবগত করাইবেন, আর বলিবেন যে, তিনি চিরদিন এই পাপময়ী পৃথিবীতে না আসেন না আসুন, কিন্তু আমি যে কয়েক দিন জীবিত থাকি, সেই কয়েক দিন যেন বৎসরান্তে তিন দিনের জন্য একবার দর্শন দিয়া অনন্যগতি সন্তানের প্রাণ রক্ষা করেন। মা না আসিলে দুর্গাশরণ নিশ্চয়ই জীবিত থাকিবে না। কেবল দুর্গাশরণ নহে, দুর্গাশরণ তাঁহার অতি জঘন্য তনয়, কিন্তু

পৃথিবীর মধ্যে যাঁহারা তাঁহার প্রিয় তনয়, তাঁহাদের কেহই প্রাণধারণে সমর্থ হইবেন না। পৃথিবীতে, তাঁহাকে "মা" বলিতে আর কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না। ভগবন! এই দেখুন, আপনার কথা শুনিয়া এখনই আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া সর্ব্বাঙ্গ শীর্ণ হইতেছে, অন্তর জ্বালাময় হইতেছে! মাগো! ওমা! মা! তোর সন্দর্শনের নিরাশ বাক্য শুনিয়া তোর দুর্গাশরণ মনে প্রাণে বঞ্চিত হইল, দেহেন্দ্রিয় অচেতন হইল, মা একবার দর্শন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর্; মা গো! ও মা! একবার দর্শন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর্।"

এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দুর্গাশরণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। দুর্গাশরণ উঠিয়া বসিলেন, এবং পরিদৃষ্ট ঘটনাবলী সমস্তই স্বপ্নের বিষয় বলিয়া বুঝিলেও তাহা জাগ্রত ঘটনার ন্যায় যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। তখন তিনি মায়ের আগমনে একবারে হতাশ্বাস হইলেন এবং মুহুর্ম্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে রজনীর শেষ হইল। দুর্গাশরণ অতি বিষণ্ণভাবে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করিয়া মায়ের আগমনের উপায় সম্বন্ধে মনে মনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

দুর্গাশরণ।—(মনে মনে) যাহা দেখিলাম, সমস্তই সত্য, স্বপ্ন হইলেও উহার কিছুই মিথ্যা হইবার নহে। যে কালে,

যে ভাবে স্বপ্ন দেখিয়াছি, উহা বায়ু-পিত্তাদির কল্পনা হইতে পারে না। ভগবান্ যথার্থই আসিয়া আমাকে প্রকৃত ঘটনা বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। না হইলে কালি অত ডাকিয়াও মায়ের কোন সাড়া পাইলাম না কেন? মা নিশ্চয় আসিবেন না বলিয়াই এবার স্থির করা হইয়াছে। ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন, সমস্তই যথার্থ। মায়ের আর আসিতে ইচ্ছা নাই, ইচ্ছা কথঞ্চিৎ হইলেও দেবগণ তাহার প্রতিবন্ধক হইবেন। প্রিয়তনয় দেবগণের অনুরোধ অনাদর করিয়া মা আসিবেন কিরূপে? এখন কি উপায় করিব? কেমন করিয়া মাকে আনিব? মা না আসিলে তো জীবন থাকিবে না। আমার এমন কোন ক্ষমতাও নাই যে, মায়ের স্নেহ আকর্ষণ করিব। আমি নরাধম নরকের কীট, মাকে ভাল বাসিতে জানি না, সেবা করিতে জানি না, প্রাণ খুলিয়া ডাকিতেও জানি না। তাহাতে আবার—অতি দীন দুঃখী দরিদ্র। একটি উপহারও মনের মত সংগ্রহ করিতে সমর্থ নহি। ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবেরাদি দেবগণও তো তাঁহাদের সর্ব্বপ্রযত্ন-লভ্য পীযূষাদি উপহারও মায়ের ভোগের অযোগ্য বলিয়া শঙ্কিত হয়েন। তবে আমি মায়ের যোগ্য উপহার কোথায় পাইব? আমার প্রতি মায়ের স্নেহ হইবে কিসে? তবে মায়ের নাকি নিঃস্বার্থ স্নেহ, তাই বলিয়াই এতদিন তাহার ফল পাইয়াছি, কিন্তু এবারে তো তাহারও আশা নাই! এবার সমস্ত দেবগণ একত্রিত হইয়া মায়ের আগমনের প্রতিবন্ধক, তাঁহারা সকলেই মায়ের প্রিয় তনয়। তাহাতে আবার মায়ের নিজেরও আসিতে ইচ্ছা নাই। তবে আর কি উপায় করিব? কেমন করিয়া মায়ের

দর্শন পাইব? প্রাণ যে অধীর হইতে লাগিল! মা না পাইলে তো জীবন রাখিতে পারিব না।” এবম্বিধ নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে দুর্গাশরণের অন্য চিন্তা, অন্য ধ্যান, জ্ঞান সমস্তই বিদূরিত হইল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, তন্দ্রা ও সংসারাদি সমস্তই বিস্মৃত হইল। দুর্গাশরণ একেই মায়ের ভাবে উন্মত্ত বলিয়া সাধারণের নিকট পাগলরূপে পরিচিত, তাহাতে আবার ঘন ঘন চিত্ত-বিভ্রম হওয়ায় একেবারেই পাগল হইয়া উঠিলেন ;—মায়ের ভাবনায় অধিকতর উন্মত্ত হইলেন। পূজার দিন যতই সন্নিহিত হইতে লাগিল, দুর্গাশরণ-পাগলের উন্মাদ ভাব ততই বৃদ্ধি পাইয়া, মায়ের অভাব-যন্ত্রণানল ততই প্রজ্বলিত হইল। দুর্গাশরণ একরূপ জ্ঞানশূন্য হইলেন ;—দিন নাই, রাত্রি নাই, সকল সময়েই বিলাপ করিতে লাগিলেন। চেতন নাই, অচেতন নাই, সকলকেই হৃদয়ের বেদনা জানাইতে লাগিলেন। সেই দিন দুই প্রহরের সময়ে আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া এইরূপ বলিতেছিলেন ঃ—

ভাই! আকাশ! তুমি কি নিমিত্ত এই অপূর্ব্ব সাজে সাজিয়া বসিয়াছ? এবার আর এ পবিত্র বেশ কেন? অবিশ্রান্ত তিন মাস পর্য্যন্ত পবিত্র মেঘ-সলিলে গাত্র ধৌত করিয়া এত পরিষ্কৃত হইয়াছ কেন? সমস্ত কালিমা, সমস্ত আবিলতা বিমুক্ত হইয়া এত মনোহর বেশ ধরিয়াছ কেন? আমার মা এবার আগমন করিবেন না। ভাই! তুমি কাহার নিমিত্ত ঐ সিতাভ্র-বিনির্ম্মিত শ্বেত ছত্রটি ধারণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছ? আমার রাজরাজেশ্বরী মা এবার আগমন করিবেন না। প্রাণ-সুহৃৎ গগন! তোমার এ সব দেখিয়া আমার প্রাণ আকুল হইতেছে, আমি অধীর হইতেছি; অতএব দোহাই তোমার,

তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এ সব পরিত্যাগ কর, আবার পূর্ব্বাবস্থায় দাঁড়াইয়া থাক, মা আমার আগমন করিবেন না। মা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, মা এবার আগমন করিবেন না।

মুগ্ধ দিগ্বধূগণ! তোমাদের সরল হৃদয়ে আঘাত করিতে আমার দুঃখোদ্বেগ দ্বিগুণীকৃত হইয়া উঠিতেছে! তোমরা অবলা—সরলা, তাই আশ্বিন মাসের সমাগম দেখিয়া এত অহ্লাদ, এত আমোদ। অন্য বারের মত এবারেও মায়ের পরিচর্য্যার আশায় সেই প্রসন্ন বেশে—বিমল কলেবরে সাজিয়া বসিয়াছ, অন্তরে অন্তরে উৎফুল্ল হইয়া ঈষদীষৎ হাস্য করিতেছ! সরলাগণ! এবার ইহার পরিণাম প্রাণনাশক গরল! ইহাতে তোমাদের মৃত্যু সাধন করিবে, উহা এখনই এই হতভাগ্য ব্রাহ্মণের পঞ্চপ্রাণের মর্ম্মে মর্ম্মে ভেদ করিতেছে! বধূগণ! আর সহিতেছে না। আমার মা এবার আগমন করিবেন না! তোমরা আবার বর্ষার সাজে দাঁড়াইয়া আমার মা-বিষয়ে বিস্মৃতি করিয়া দেও! মা এবার আগমন করিবেন না। তোমাদের ঐ সাজ দেখিয়া দুর্গাশরণের প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে! অতএব রক্ষা কর, ও সাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ কর।

গ্রহরাজ! আপনি তো সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ! আপনি এরূপ করিতেছেন কেন? আপনি কাহার নিমিত্ত এবার এত সংবধান হইতেছেন? কাহার আসিবার সময়ে রৌদ্র ক্লেশ হইবে বলিয়া নিজের মণ্ডলটি এত দক্ষিণে—এত দূরে সরাইতেছেন? কি জন্য তীক্ষ্ণ রশ্মিমালা সংযত করিয়া মৃদু মৃদু কিরণ বিকীর্ণ করিতেছেন? তিনি তো এবার আগমন করিবেন না! যাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত ঐ নির্ম্মল মৃদু মৃদু সুপবিত্র আলোক-মালায় নিজ গৃহটি

সাজাইতেছেন, তিনি তো এবার আগমন করিবেন না! মা আমায় বিষ্ণুর দ্বারা সংবাদ দিয়াছেন, এই পাপময়ী ধরণীতে আর আগমন করিবেন না। ভাস্কর! এবার আপনি ঐরূপ সাজে বিড়ম্বিত হইতেছেন, আমার মত দুঃখিগণের মর্ম্ম-স্থান বিদ্ধ করিতেছেন, আপনি প্রসন্ন হউন, এ বেশ পরিত্যাগ করিয়া সেই পূর্ব্ববেশে উপনীত হউন।

সুধাকর! তুমি কাহার প্রীতি-সাধনের নিমিত্ত এত যত্নে এত সাবধানে দেহটিকে পরিষ্কৃত করিয়াছ? আমার মা এবার আগমন করিবেন না! যাঁহার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মৃদু গম্ভীর হাস্য করিতেছ, দিগ্বধূগণ বিহ্বল করিতেছ, তিনি এবার আগমন করিবেন না।

ভাই, সমীরণ! তুমি এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া মৃদু মৃদু পদচারে বেড়াইতেছ কেন? কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছ? তিনি এবার আগমন করিবেন না। কাহার সেবার নিমিত্ত অনুষ্ণ অশীতভাবে এত সাবধানে সজ্জিত হইয়াছ, এত নিরাময় নিরাবিলভাব ধারণ করিয়াছ? তিনি এবার আগমন করিবেন না। তুমি ছয় মাস পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অবিশ্রান্তে যাঁহার অন্বেষণে উত্তর কুরুর শেষ পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছ, সেই জগদম্বা মা আমার আগমন করিবেন না। আগে আগে উত্তর হইতে আসিয়া যে আগমনের ঘোষণা করিতেছ, তাহা এবার ঘটিতেছে না। মা আর এ পৃথিবীতে পদার্পণ করিবেন না। ভাই! প্রাণ রক্ষা কর, তোমার এই বেশ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববেশে সজ্জিত হও!

মা জাহ্নবি! তুই তো মার প্রিয়সখী! মা হিমালয়ে আসিয়া

তো তোর সঙ্গে কত খেলা করিত! তোকেও কি মা ভুলিয়া রহিয়াছে? তুমি যাহার সমাগম প্রত্যাশা করিয়া কত পর্ব্বত, বন, কণ্টকাদি অতিক্রম করিয়া এই ধরণীতে অবতীর্ণা হইয়াছ, তিনি আর আগমন করিবেন না। যাঁহার পদস্পর্শ-লালসায় এত পবিত্র বিশুদ্ধ বেশ ধারণ করিয়াছ, সেই মা এবার আগমন করিবেন না! মা! তোর এ বেশ দেখিয়া আমার প্রাণ শীর্ণ হইতেছে, তুই শীঘ্র এ বেশ পরিত্যাগ কর্।

পঙ্কজগণ! তোমরা কাহার দুঃখ সন্দর্শনের নিমিত্ত জীবন-সম্বল সলিল-শয্যা হইতে এত উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছ? কাহার চরণ-স্পর্শের আশায় আশায় প্রাণ-সম্বল শুকাইলেও কথঞ্চিৎ জীবিত রহিয়াছ? তিনি আর এই পৃথিবীতে আগমন করিবেন না। স্থলারবিন্দগণ! তোমরাই বা বিড়ম্বিত হইতেছ কেন? মা আর ভারতভূমি স্পর্শ করিবেন না। যাঁহার শ্রী-অঙ্গের শোভা-বৃদ্ধির নিমিত্ত তোমরা স্তবকে স্তবকে কলিকাবলী গর্ভমধ্যে পোষণ করিতেছ, তিনি আর আগমন করিবেন না! মা তত্ত্ব পাঠাইয়াছেন, তিনি আর আসিতে পারিবেন না। তোমরা এ ভাব পরিত্যাগ করিয়া আপনাপন কর্ত্তব্য চিন্তা কর;—সকলেই একত্র হইয়া প্রাণ খুলিয়া মাকে ডাকিতে থাক। তোমরা সকলেই মায়ের প্রিয়পাত্র সেবক। কিন্তু আমার কৃতাঞ্জলিপুটে অনুরোধ, তোমরা এ বেশ পরিত্যাগ কর। তোমাদের এ বেশ দেখিয়া আমার মায়ের কথা মনে পড়িতেছে, প্রাণ অধীর হইতেছে, হৃদয় বিহ্বল হইতেছে, তোমাদের অতি দারুণভাব অনুভব করিতেছে, জীবন শুষ্ক হইতেছে; অতএব রক্ষা কর, দুঃখী ব্রাহ্মণ-তনয়ের জীবন দান কর, এ সকল কুলক্ষণ পরিত্যাগ কর। মা যে আমার আগমন

করিবেন না,—পাপময়ী ধরণীকে দর্শন করিবেন না। মাগো! আর সহিতে পারিতেছি না। তোর অভাব অনুভব করিয়া প্রাণ অধীর হইতেছে। তোর প্রিয় শরৎকাল আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। উহার এক এক লক্ষণ বিকসিত হইয়া বিষের ন্যায় আমার মর্ম্মবন্ধন খুলিয়া দিতেছে। উহাদিগকে দেখিলেই,—মা! তোর সেই প্রাণভরা রূপ মনে পড়িতেছে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ-বন্ধন ছিন্ন হইতেছে। মাগো! ও মা! তোর সেই দয়ামাখা, স্নেহমাখা মুখখানি মনে পড়িয়া আমার জীবন-রাজ্য অন্ধকার করিতেছে। সেই হাসি হাসি মুখখানি,—সেই টুক্‌টুকে মুখখানি আমার অন্তর শূন্যময় করিল, আমায় অস্থির করিয়া ফেলিল। মাগো! একবার দেখা দিয়া প্রাণ রক্ষা কর্, তোর অনন্যগতি দুর্গাশরণের জীবন দান কর্, তোর সেই মুগ্ধ মুগ্ধ মধুমাখা মুখখানি দেখাইয়া হৃদয় শীতল কর, সেই অভয়প্রদ মুখখানি, সেই নিরাশের আশাস্থলী মুখখানি দেখাইয়া প্রাণ আশ্বস্ত কর্। অভয়ে! বড় ভীত হইয়াছি,—সংসারসমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া বড় অধীর হইয়াছি, একবার ভয় নিবারণ কর্। সেই অমৃতমাখা কথার দ্বারা প্রাণ সুস্থির কর্। মাগো! ও মা! আর সহ্য হইতেছে না, একবার দেখা দিয়া প্রাণ রক্ষা কর্। দরিদ্রের ধন, অনাথের অবলম্বন তোর সেই রাঙ্গা পা-দুখানি চিন্তা করিয়া আমার চৈতন্য নষ্ট হইতেছে, একবার দেখা দিয়া প্রাণ রক্ষা কর্। মাগো! আমি সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া যাহার ভরসায় জীবন রাখিতে-ছিলাম, সেই পা-দুখানি দেখাইয়া প্রাণ রক্ষা কর্। ধ্যানে, জ্ঞানে, ক্রিয়াকালে দুর্গাশরণের আর কিছুই নাই, পা-দুখানি দেখাইয়া প্রাণ রক্ষা কর্। মাগো! ও মা! ঐ পা-দুখানি

ব্যতীত আর কিছুই নাই, একবার দেখা দিয়া প্রাণ রক্ষা কর্।

এইরূপ নানাবিধ চিন্তা ও প্রলাপ করিতে করিতে, দুর্গাশরণের সেই উন্মত্ততা ও অধীরতা শেষ সীমায় উপনীত হইল। এখন তিনি অন্য কাহারো সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ করেন না, অন্য কিছুতে দৃষ্টি বা লক্ষ্যও নাই, ক্ষুধা তৃষ্ণা বা আহার নিদ্রাও নাই, এখন তিনি নিজে নিজেই কখনো ক্রন্দন, কখনো হাস্য,কখনও বা বিষণ্ণ হইয়া নানারূপ জল্পকল্পনা করিতেছেন, নিজে নিজেই কত প্রশ্ন করিতেছেন, আবার তাহার উত্তর দিতেছেন, নিজেই ক্রুদ্ধ হইতেছেন, আবার প্রসন্ন হইতেছেন, এবং নিজে নিজেই আশ্বস্ত হইতেছেন আবার নিরাশ্বাস হইতেছেন। সুতরাং দুর্গাশরণের প্রতি, সাধারণের সেই পাগল কল্পনা এখন সত্য ঘটনায়ই পূর্ণ মাত্রায় উপস্থিত হইয়াছে।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

এরূপ অবস্থায় থাকিতে থাকিতে, ক্রমে পূজার দিন সন্নিহিত হইল। তত্ত্বানভিজ্ঞ প্রতিবাসিগণ, যে যে ভাবে পূজা করিয়া থাকে, সে সেই ভাবেই পূজার উদ্যোগাদি করিল। দুর্গাশরণের পরিবার বর্গও, তাঁহার ঐরূপ উন্মাদাবস্থা দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ ভাবে বিশুষ্ক হৃদয়ে যথাশক্তি, পূজায়োজন করিলেন। ক্রমে সপ্তমী দিন সমাগত হইল, অধিবাস রাত্রির নক্ষত্রমালা ক্ষীণপ্রভা হইয়া উঠিল, পূর্ব্বদিক আতাম্র প্রভায় রঞ্জিত হইল। যূতি, মালতী, সেফা-

লিকাদি কুসুমাবলীর সৌরভে সেই প্রভাত-সমীরণ রসাল হইয়া যেন মায়ের ব্যজন-সেবায় প্রস্তুত হইল, মুগ্ধ মধুকরগণ কল-গুঞ্জনের দ্বারা মায়ের শুভাগমন ঘোষণা করিতে লাগিল, সপল্লীস্থ প্রতি-বাসি-ভবনের শঙ্খ ঘণ্টা পটহাদি নিস্বনে দশদিক উদ্বোধিত হইল।

এদিকে, দুর্গাশরণ মহাশয়, বাতোল্বনাতুরের ন্যায় উঠা বসা করিতে করিতে কথঞ্চিৎ রজনী অতিবাহিত করিতেছেন। ইদানীং সেই প্রভাত সময় আসিয়া তাদৃশ ঘটনাবলীর দ্বারা তাঁহার হৃদয়-মর্ম্মের যাতনা আরো উদ্বেলিত করিয়া তুলিল, দুর্গাপ্রাণ দুর্গাশরণের দুর্গাবিয়োগ যন্ত্রণা, এখন কোন মতেই সহ্য হইতেছে না, উহা তাঁহার হৃৎপুণ্ডরীক শূন্য করিয়া ফেলিতেছে, ফুপ্‌ফুস্‌-দ্বয় নিষ্ক্রিয় করিয়া তুলিতেছে। দুর্গাশরণ তখন কথঞ্চিৎ গাত্রোত্থান করিয়া সকাতরে বলিতে লাগিলেন।

দুর্গাশরণ।—হা! এ কি হইল! এখন যে সত্য সত্যই জীবনের শেষ সময় হইয়া উঠিল! প্রভাত রজনি! এ হতভাগ্য তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিল! দুর্গাশরণ মায়ের নিকট শতাপরাধী হইলেও, তোমার তো কখনো কিছু করে নাই! তুমি কেন ইহার প্রাণ সংহারে প্রবৃত্তা হইলে? কি কারণ এই সকল ঘটনাবলীর দ্বারা মাতৃ-বিয়োগ-বিধুর দুর্গাশরণের মর্ম্ম-সন্ধিগুলি ছিন্ন ভিন্ন করিতেছ? হতভাগিনি! তুমি মধুকর মুখে কিসের সুপ্রভাত ঘোষণা করিতেছ? সুরভি সমীরণ প্রবাহের দ্বারা কিসের মাঙ্গল্য সম্পাদন করিতেছ? দুর্ম্মেধগণ! তোমরা কোন্ উৎসবের জন্য বাদিত্রনিস্বনে বায়ুমণ্ডল উচ্ছ্বসিত করিতেছ? তোমরা কি অবগত নও, মা আর এই পাপময়ী ধরণীতে পদার্পণ

করিবেন না? হউক, চিরসহায় হইয়া তোমরাও যখন পরিপন্থী হইলে, তখন মাতৃপ্রাণ দুর্গাশরণের মা-শূন্য জীবন আর কিছুতেই থাকিতেছে না, অতএব একবার শেষ চেষ্টার সমাধা করিয়া নিজ হইতেই ইহার নির্গমনের আনুকূল্য করিব।

এইরূপ বলিয়া দুর্গাশরণ, পরিবারবর্গকে পূজার আয়োজনে অনুমতি করিয়া প্রাতঃস্নানাদি সমাধান্তে পূজাসনে উপবিষ্ট হইলেন। এবং মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেনঃ—

দুর্গাশরণ।—(মনে মনে) এখন কি করিব, কি জন্য পূজাসনে বসিলাম, কি জন্যই বা এই সকল আয়োজন হইল। মা তো নিশ্চয়ই আগমন করিবেন না। পুরুষোত্তমের বাক্য তো কদাপি মিথ্যা হইবার নহে! তবে এখন কি হইবে, কি নিমিত্ত এ সমস্ত হইল? হউক, তথাপি একবার যথাবিধি মন্ত্র পাঠাদির অনুষ্ঠান করিয়া দেখি, তৎপরে শেষ কর্ত্তব্যের অবধারণ করিব।

এইরূপ স্থির করিয়া দুর্গাশরণ পূজানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। মনের ব্যগ্রতা, প্রাণের ব্যাকুলতা যাহা কিছু ছিল সমস্তই সমর্পণ করিয়া মন্ত্রাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন, আহ্বান মন্ত্র সমস্তই নিঃশেষিত হইল, তাঁহার দেবীসূক্তের উদ্ঘোষণে আকাশমণ্ডল সংক্ষুব্ধ হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, সমস্তই নিরর্থক হইল। মায়ের আগমনের চিহ্নও অনুভূত হইল না। দুর্গশরণ তখন মায়ের আগমনাশা একেবারেই বিসর্জ্জন করিলেন, জগন্মাতা এবার পদার্পণ করিবেন না ইহা নিশ্চয়রূপে অবধারিত হইল। তখন তিনি বৃথা পূজানুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক শেষ কর্ত্তব্যের অবধারণ করিয়া, মণ্ডপসমীপে অগ্নিপ্রজ্বালনের নিমিত্ত অনুচরগণকে আদেশ করিলেন। অনন্তর তাঁহারাও দুর্গাশরণ মহাশয়ের প্রকৃত

অভিসন্ধি বুঝিতে না পরিয়া সেই শোকাবহ আদেশ পালন করি-লেন। মণ্ডপসমীপে বৃহদায়তন উচ্ছিখ হুতাশন প্রজ্বলিত হইলেন, তাঁহার লেলায়মানা সপ্তজিহ্বা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল।

এদিকে আনন্দময়ীর কৈলাসধামে যেন এক একরূপ অদৃষ্ট-পূর্ব্ব অবস্থা দৃষ্ট হইতে লাগিল। আনন্দময় কৈলাস যেন বিক্ষুব্ধবৎ হইল, কি যেন একরূপ বিষণ্ণভাব সূচিত করিতে লাগিল, তাহার চিরন্তনী সেই কোটি সুধাংশুসদৃশ প্রভা যেন প্রক্ষীণা হইল, সেই অলৌকিকী শোভা যেন পরিম্লান হইল, মাঙ্গল্য-লক্ষ্মী যেন নিশ্রীকা হইলেন, মায়ের সেই সুস্নিগ্ধ শ্রীমুখচন্দ্রিকা যেন প্রভাত চন্দ্রিকার ন্যায় শুষ্ক ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল।

এখানে দুর্গাশরণ মহাশয় সেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের অভি-মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেনঃ—

দুর্গাশরণ।—দ্বিজকুল গুরো! আপনাকে প্রণাম। আপনি সুপ্রসন্ন হইয়া ব্রাহ্মণাধমের অভিপ্রায় পূর্ণ করুন। গুরো! আপনি সেই শ্মশানীয় আকৃতি গ্রহণ করিয়া ক্রব্যাদাগ্নিরূপে অধিষ্ঠিত হউন। অনন্তর এই দ্বিজাধমের দেহ আহুতিটি গ্রহণ করিয়া জগন্মাতার তৃপ্তি সাধন করুন। হব্যবাট্! আপনি ব্রহ্মহত্যার আশঙ্কা করিবেন না, কারণ আপনি এই শব দেহই গ্রহণ করিতেছেন। ইহার পঞ্চপ্রাণ মায়ের নিকট উড়িয়া গিয়াছে। গুরুদেব! আপনি পাবক হইলেও, শ্মশানের ক্রব্যাদরূপে শবশরীর আত্মসাৎ করিতে বাধা বোধ করেন না, তাই, আজ সেইরূপে আপনাকে নিমন্ত্রণ করিতেছি। হুতাশন! আপনার সর্ব্বত্র প্রণাম।

এই বলিয়া জ্ঞানার্ণব দুর্গাশরণ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অগ্নির দক্ষিণ

ভাগে আসিলেন, এবং উর্দ্ধবাহু কৃতাঞ্জলি হইয়া সাশ্রুনয়নে সগদ্‌গদ কণ্ঠে মাকে দুটিকথা বলিতে লাগিলেন।

দুর্গাশরণ।—মাগো! ত্রিলোকেশ্বরি! মা! আমি তোর সেই দুর্গাশরণ, সেই দীন, হীন, অকৃতি সন্তান দুর্গাশরণ। জগদম্বিকে! তোর হতভাগ্য দুর্গাশরণ আজ শেষ প্রার্থনা করিতেছে। মাগো! একটু অভিমুখীনা হইয়া অধম তনয়ের দুটিকথা শোন। দয়াময়ি! তোর দুর্গাশরণ এখন আর কিছুই চাহিতেছে না, তোকে আর আসিতে হইবে না, পাপময়ী পৃথিবীকে দেখিতে হইবে না, আমার পূজা অর্চ্চনা সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য তোর প্রিয় দেবগণের কোন হানি হইবে না। মাগো! তুই কৈলাস হইতেই একটু দৃষ্টি করিয়া আমার এই অগ্নি-সমর্পিত দেহাহুতিটি মাত্র গ্রহণ করিবি; এতদ্ব্যতীত ইহা হুতাশনে কবলিত হইলে যখন পঞ্চপ্রাণ উড্ডীন হইবে, তখন ক্ষণকালের জন্য আমার অন্তর্নয়ন-সম্মুখে একবার দাঁড়াইতে হইবে।

মাগো! আমি তোর আর কিছুই চাই না,—ধন চাই না, জন চাই না, স্বর্গও চাই না, অপবর্গও কামনা করি না, চাই কেবল ক্ষণকালের জন্য তোর ঐ রাঙ্গা পা-দুখানি দেখিতে। মাগো! সেই বোধন-নবমী হইতে একাল পর্য্যন্ত কথঞ্চিৎ সহ্য করিয়াছিলাম, আজি সপ্তমীর প্রথম বেলা উপস্থিত। আজি আর সহিতে পারিতেছি না, প্রাণ রাখিতে পারিতেছি না, এখন আপনা হইতেই জীবনের শেষ হইয়া আসিল। তাই তোর দেহ আজ তোকেই সমর্পিত হইতেছে। মাগো! ও মা! এই দেখ্, আমার দেহ অবসন্ন হইতেছে, নয়নাদি ইন্দ্রিয়গণ অন্ধকারে আবৃত হইতেছে, পঞ্চ প্রাণ শুষ্ক হইতেছে, হৃদয় শূন্য হইতেছে।

মা! তুই পূজার আসা না আসিলি,—আমার আর পূজার আশা নাই, এখন এক নিমেষের জন্য একবার সম্মুখে দাঁড়া, তোর পা-দুখানি লক্ষ্য করিয়া পঞ্চপ্রাণ উড্ডীন হউক। মাগো! একবার জন্মের মত দেখিয়া লই, নিমেষের জন্য সম্মুখে দাঁড়া,—আমার পূজা-অর্চ্চনা সমস্তই থাকিল, একবার নিমিষের জন্য সম্মুখে দাঁড়া, একবার মনের সাধে মন খুলিয়া জন্মের মত "মা" বলিয়া লই, একবার নিমেষের জন্য সম্মুখে দাঁড়া। মাগো! এবার বাগিন্দ্রিয়ও ক্রিয়া ত্যাগ করিল, কণ্ঠ, হৃদয় অবরুদ্ধ হইল। আর মনের বেদনা বলিতে পারিলাম না। "মা" বলিয়া ডাকিতে পারিলাম না। এই শেষ ডাক গ্রহণ করিয়া একবার নিমেষের জন্য সম্মুখে দাঁড়া! মাগো! ও মা! মা!—মা!—মা!—মা!" এইরূপ বলিতে বলিতে দুর্গাশরণ নিঃসংজ্ঞ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই জ্বলন্ত হুতাশনমধ্যে নিপতিত হইলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে হা তাত! হা ভ্রাতঃ! হা ভক্ত! ইত্যাদি বলিয়া চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিল, জগৎ অন্ধকারময় হইল।

এদিকে, হঠাৎ কৈলাসধাম বিকম্পিত হইয়া যেন রসাতলে নিমগ্ন হইল, দশ দিক তমসাবৃত হইল। তখন কৈলাসেশ্বরী মা "দেবগণ! আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমার দুর্গাশরণ প্রাণ বিসর্জ্জন করিল, শান্ত হও, অগ্নি শান্ত হও! সাবধান! সাবধান! আমার দুর্গাশরণ সাবধান!" এই বলিতে বলিতে ক্ষণ মাত্রে সেই অগ্নি মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া দুর্গাশরণকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন, আর সান্ত্বনাস্বরে বলিলেন, বাবা! ভয় নাই, এই আমি আসিলাম, কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুর সহস্রার উপেক্ষা করিয়া এই আসিলাম, এই আমি

তোমায় কোলে করিয়া বসিয়াছি। বাবা! চেতন হও, শান্ত হও, উঠিয়া দেখ, এই আমি তোমাকে কোলে করিয়া বসিয়াছি”—এই বলিয়া সেই অমৃতস্রাবী করযুগলের দ্বারা দুর্গাশরণের মুখখানি মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। দুর্গাশরণও সেই মৃতসঞ্জীবন কর-স্পর্শে সচেতন হইয়া সেই আনন্দময়ীর আনন্দময় রূপ সন্দর্শনে মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া থাকিলেন। অনন্তর তাঁহার প্রতি-অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, মায়ের সেই তনু যষ্টি ঈষদীষৎ বেপমান হইতেছে, সেই যোগি-ঋষির জীবন-সম্বল পা-দুখানি ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে, মায়ের বদনেন্দু হইতে বিন্দু বিন্দু স্নেহ-সুধা স্যন্দিত হইতেছে, নয়নদ্বয় করুণারসে আপূরিত হইয়াছে, পয়োধর হইতে অমৃতমাখা পয়োধারা স্রাবিত হইতেছে।

এইরূপ সন্দর্শন করিয়া দুর্গাশরণ সপুলকে সাশ্রুনয়নে মাকে বলিলেন।

দুর্গাশরণ।—মা! তোর এই সুকোমল সুধামাখা তনুটীতে যে অগ্নির তাপ লাগিতেছে! ইহা যে এখন বিকম্পিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল! মাগো! ইহা দেখিয়া তো আমি আরও মর্ম্মাহত হইলাম!

জগদম্বা। না বাবা! তাহা নহে, আমার শরীরে অগ্নির তাপ লাগিতে পারে না, আমার সন্তানেরও নহে, তোমার স্নেহ-বশে আমার এইরূপ হইয়াছে।

দুর্গাশরণ।—মাগো! এ অকৃতি তনয়ের প্রতি তোর এত স্নেহ হইল কেন?

জগদম্বা।—বাবা! আমার স্নেহ সততই আছে, অকৃতি সন্তানের প্রতিই আমার অধিকতর মমতা। তুমি যে এত ক্লান্ত-

চরণ করিয়াছ তাহাও আমার মমতারই ফল। বাবা! তুমি যদি অনায়াসে আমার সন্দর্শন পাইতে, তাহা হইলে এরূপ আনন্দ-সুধা পান করিতে পাইতে না, তাই আমি এত বিলম্ব করিয়া আগমন করিয়াছি। অতএব তজ্জন্য তোমার মনোব্যথা পরি-ত্যাগ কর। এখন গাত্রোত্থান করিয়া অগ্নিকুণ্ড হইতে বহির্গত হও, আয়োজিত উপহারের দ্বারা যথেচ্ছায় আমার অর্চ্চনা কর। আমি ঐ প্রতিমাতে অধিষ্ঠিতা হইয়া সমস্ত গ্রহণ করিব।

এই বলিয়া জগন্মাতার জ্বলন্ত প্রতিমা সেই মৃণ্ময়ী প্রতিমাতে আবির্ভূতা হইলেন। দুর্গাশরণ মহাশয়ও অক্ষত শরীরে সেই জলদগ্নি হইতে বহির্গত হইয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে ভাসিতে সবান্ধবে মায়ের পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্গাশরণের প্রসাদে পৃথিবীর অন্যান্য ভক্তগণও মায়ের চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। এবার এইরূপে মায়ের ভারতবর্ষে পদার্পণ হইল। অতঃ-পর ভোলাদাসের আখ্যায়িকা শ্রবণ কর।

তৃতীয় তরঙ্গ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

ভোলাদাসের দুর্গোৎসব।

বিগত ১৮১৫ শকে শরৎকালের উপক্রমে সেই "ভবৌষধের" ভোলাদাস একান্তে বসিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন,—

ভোলাদাস।—হৃদয়! স্থির হও, শান্ত হও, ব্যাকুল হইও না।

তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা যথার্থ নহে। তাহা তোমার ভ্রম-সমুদ্ভাসিত মরুভূমির মরীচিকামাত্র।

সে কি! আবার কেন সে কথা? মায়িক চিত্রে, আবার সত্যতা জ্ঞান কেন? ভ্রাতঃ! শান্তির আরাধনা কর। ঐরূপ পরিকল্পনা পরিহার কর। বাস্তবিক এখন সে ঋতু নয়,—সে মাসও নয়।

এ কি বিড়ম্বনা! এত অশান্তি কেন? সৌম্য! মনোরথ-রচিত প্রাসাদবাস-লালসায় এত অধীরতা কেন? এত উৎকণ্ঠতা কেন? সখে! তুমিই আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন-যষ্টি। তুমি বিকম্পিত হইলে আমারও বেপথু হইয়া থাকে; তুমি স্খলিত হইলে আমিও প্রস্খলিত হই। তোমার বিপদেই আমার বিপদ, তোমার সম্পদেই সম্পদ। তাই বলি, মন! স্থির হও, তুমি ব্যাকুল হইয়া আমাকে সমাকুলিত করিও না। বাস্তবিক এই সে শরৎকালও নহে, আশ্বিন মাসও নহে। শাস্ত্রে যে, মলমাস আর অধিমাসের কথা শুনিয়াছ, এবার সেইরূপ একটা নূতন মাস আর নূতন ঋতু হইয়াছে। এই ঋতুর নাম ব্যাধি-ঋতু, আর মাসের নাম আধিমাস। ইহারা অতীব মনঃকষ্ট-প্রদ, এ নিমিত্ত 'আধি' আর শরীরেরও বিশেষ যন্ত্রণাবহ, এজন্য 'ব্যাধি' নাম গ্রহণ করিয়াছে। অতএব এখন অধীর হওয়া উচিত নহে, এখন অতি ক্লেশে কোনমতে এই কয়েকটা দিন কাটাইতে হইবে।

ভ্রাতঃ! এ কি হইল! তুমি যে কোনরূপেই প্রবুদ্ধ হইলে না! কোন কথাই বিশ্বাস করিলে না! ক্রমেই যে অধীর হইতে লাগিলে! সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও অধৈর্য্য-সাগরে ডুবাইতে বসিলে। সখে! স্থির হও, রক্ষিত হও, আমাকেও পরিরক্ষিত কর। এবার

কখনই কোন আশা পূরিবার নহে। কেবল এবার কেন, এ জন্মেও নহে, এ মুমূর্ষু-জীবনের নিঃশেষ হইতে যে কয়েক দিন অবশিষ্ট থাকে, তাহার মধ্যেও নহে। কারণ সে আর নাই। হৃদয়! তুমি যাহার আসার আশা করিতেছ, সে জীবিত নাই। তাহার পঞ্চপ্রাণ ব্যাপক বায়ুমণ্ডলের সহায় হইয়াছে। প্রাণ! তুমি বিশ্বাস কর, সে নাই, তাহার শেষ নিঃশ্বাস বহিয়া গিয়াছে! ভাবিয়া দেখ, সে যদি থাকিত, তবে কি আমাদের এরূপ নিদারুণ অবস্থা হইতে পারে? রাজরাজেশ্বরী জীবিতা থাকিলে কি তাহার রাজ্যে এত অবিচার হইতে পারে? রক্তবীজভক্ষিণী মা অদ্যাপি বাঁচিয়া রহিলে কি সন্তানগণ পাপ রাক্ষসমুখে কবলিত হইতে পারে? সেই বিড়ালাক্ষ-চর্ব্বিণী, মহিষমর্দ্দিনীর প্রাণ সুপ্রতিষ্ঠ থাকিলে কি এই পাপরূপ নৃশংস ব্যাধগণের দ্বারা নিজ গর্ভজগণের এইরূপ শূলাকৃত হওয়া * সহ্য করিতে পারে? তাহা কখনই নহে। তাই বলি, মা আর জীবিতা নাই, তাঁহার দেহলীলার শেষ হইয়াছে। আরও দেখ, কেবল ইহাও নহে, ব্রহ্মণ্যদেবরূপিণী মায়ের নিঃশ্বাসবায়ু প্রবহমান থাকিতে তাহার অধিষ্ঠান-ভূমি ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের এরূপ দশা কদাপি হইতে পারে না। ঐ দেখ, উহাঁরা কিরূপ অবস্থায় জীবন ধারণ করিতেছেন! ইহাঁদের দেহের প্রতি দৃষ্টি করিলে আপাততঃ জীবিত বলিয়াই মনে হইতে চায় না! কেবল "দুর্গে! দুর্গতিহরে!" এই কথাটী মুখ হইতে প্রবাহিত হইতেছে বলিয়াই তাহার আনুকূল্য করে। আর মনে হয়, বুঝি ঐ নামটা লইবার নিমিত্তই উহাঁরা ঐরূপ জীবনভার বহন করিতেছেন। নতুবা, দশদিক্ শূন্যময় দেখিয়া এ ছার

* কাবাব আকারে পক্ক হওয়া।

জীবন থাকিতে পারে কি ? একদিন পরে, দুই দিন পরে আহার করিয়া এ জীবন থাকিতে পারে কি ? ধনী লোকের নিকট এত অপমান, এত গ্লানি, এত যন্ত্রণা বহন করিয়াও রহিতে পারে কি ? তাহা কদাপি সম্ভবপর নহে, অথচ স্বপ্নেও মায়ের কোন সাড়া-শব্দ নাই। তাই বলি, ব্রহ্মণ্যদেবী মা আর জীবিতা নাই।

আরও দেখ, যাহার স্নকটাক্ষ প্রতীক্ষার প্রতি নির্ভর করিয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব অবস্থিতি করিতেছে, তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠ-মান থাকিলে আপন সন্তানের প্রতি সেই ইন্দ্রের দ্বারা এত অত্যাচার হইতে পারে কি ? এই দেখ, সেই মাঘ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত কি ভয়াবহ বর্ষণ হইতেছে! এক-পক্ষ, দুইপক্ষ ব্যাপিয়া যখন বর্ষারম্ভ হয়, তখন মনে হয়, বুঝি এইবারই মহাপ্রলয় হইল, এইবারই সমস্ত পৃথিবীটা সমুদ্রসাৎ হইল। এইরূপ প্রলয়াকার বর্ষাপাত অবিরল ধারাবাহী হওয়ায় আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন বীজ ধান্য-বীজ এবার ক্ষেত্র সংস্পর্শও করিতে পাইল না। যদিও কোন কোন স্থানে করিয়াছিল বটে, কিন্তু দেবরাজ তাহাও সহিতে পারিলেন না। তিনি যেন কালান্তকের ন্যায় রোষাবিষ্ট হইয়া অজস্র সবজ্র করকাপাত ও মুষলায়মান ধারা-সম্পাতের দ্বারা, ভ্রূণহত্যা, নরহত্যা, স্ত্রীহত্যা, গোহত্যার পাপ বিস্মৃত হইয়া, সকলের প্রাণের সহিত সেই অঙ্কুরিত-বীজমালাকে উন্মূলিত করিয়াছেন। পরে আবার পৌনঃপুন্য বপনের দ্বারা, যেন দেবরাজের ভয়ে লুকাইয়া উদ্যানচত্তর পরিত্যাগ করিয়া গ্রাম-সন্ধিস্থানে যে কয়েকটী ধান্যগুচ্ছ জন্মান হইয়াছিল, তাহাও তিনি জানিতে পাইয়া যেন দ্বিগুণতর অমর্ষভরে অধীর হইলেন; অমনি যুগান্ত-

কারী বরুণকে পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া ঘোরতর বন্যার দ্বারা, সে ধান্য তো রসাতলে নিমগ্ন করিলেনই, তৎসঙ্গে সঙ্গে শত শত গ্রামকেও স্থাবরজঙ্গম প্রাণি-পুঞ্জের সহিত মহা-প্রলয়ের ন্যায় বিপ্লাবিত করিলেন!—সমস্ত জলময় হইয়া গেল! প্রথমে গবাশ্বাদি পশুগণের প্রাণাবলম্বন তৃণশস্যাদি অদৃশ্য হইয়া গেল, পৃথিবীর হরিতবর্ণ অন্তর্হিত হইল। পরে জলরাশি আরও পরিস্ফীত হইলে সকলের বাসস্থান অধিকার করিল। প্রাঙ্গণ আপ্লাবিত করিল। এবার পটোল, বার্ত্তাকু, অলাবু, কুষ্মাণ্ডাদি মানব-প্রাণসহায় গুচ্ছলতা সকল প্রাণ বিসর্জ্জন করিল, সঙ্গে সঙ্গে শরৎকালে মায়ের চরণসংস্পর্শ-মানসে সমুৎ-ফুল্ল কুসুমলতা-গুল্মাদিও অদৃশ্য হইয়া গেল। অবশেষে সক-লের প্রাণ বিপ্লাবনের নিমিত্ত দারুণ জল-সঙ্ঘাত গৃহের মধ্যেও প্রবেশ করিল; গৃহে যাহা কিছু ছিল, সমস্তই আত্মসাৎ করিল; যাহা যেরূপ সম্ভব,—কত কিছু মগ্ন করিয়া ফেলিল, কত কিছু ভাসাইয়া লইল, কত কিছু গলাইয়া ফেলিল। গৃহের উচ্চাঙ্গগুলি ঢোঁড়া, বোড়া প্রভৃতি জলসর্পের অধিকৃত হইল। এদিকে, মাঠ হইতে লবণ-সমুদ্রের তরঙ্গের মত গগনস্পর্শী তরঙ্গশ্রেণী আসিয়া প্রাণিগণের সেই মুমূর্ষু প্রাণের উপরে আবার কঠোরতর উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল, সেই কক্ষমাত্র বক্ষমাত্র জলে দণ্ডায়মান, হিন্দুকুলের, কৃষককুলের প্রাণাধিক, নিরাহারে অস্থিচর্ম্মসার গো-মহিষাদি পশুগুলিকে উন্মথিত করিয়া একবার ভাসা, একবার ডুবা করিতে করিতে অবশিষ্ট প্রাণ অপহরণ করিয়া ভাসাইয়া নিল। বিড়াল-কুকুরাদি গৃহপশু, শৃগাল-শূকরাদি বন্যপশুগণের তো অস্তিত্বের চিহ্নই নাই। তৎপর,

বৃক্ষগুলির অবস্থাও দেখ। ঐ দেখ, আমাদের প্রাণাপ্যায়নকারী, ফলশালী কদলীতরুগুলি শাখাহস্তোত্তোলনে সন্তরণ করিতে করিতে নিজের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দান করিয়া কিছু দিন জীবিত ছিল, পরিশেষে সকলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে! সন্তরণে অসমর্থ সেই যত্নাতিশয়লালিত শেলু, বিল্ব, পনসাদি বৃক্ষগুলিও আমাদের চিরসম্ভৃত আশার সহিত শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। শুক সারিকাদির নীড়গুলি কর্কট-কূর্ম্মাদির অধিকৃত হইলে, তাহারা বৃক্ষের উচ্চশাখায় আরোহণ করিয়া হাহারব করিতেছে। মানবগণ, বংশের ভেলা, কদলীর ভেলা, তালের ডোঙ্গা, কেহ কেহ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাতে ভাসিতে ভাসিতে স্বতঃসিদ্ধ জীবন-মমতা প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? জলের হস্তে বাঁচিলেই তো শেষ হইল না। এদিকে, পূর্ব্ববৎসরে দেশে ধান্যাদি যাহা কিছু জন্মিয়াছিল, বণিক্‌গণ আমাদের প্রাণের আশার সহিত তাহা নিঃশেষে গ্রহণ করিয়া কোন্ দেশে লইয়া গিয়াছে, তাহার ঠিকানাও নাই; এখন অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল বা আছে, তাহাতেও বণিগ্‌বৃত্তির বিশ্রাম নাই। সুতরাং ধান্য-তণ্ডুলের অভাব হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি মুদ্রায় সাত আট সের মাত্র তণ্ডুল বিক্রয় হইতেছে। এদিকে এইরূপ হইল, আবার অপরাপর প্রদেশে অনাবৃষ্টির দ্বারা সমস্ত ভস্মীভূত হইয়া উঠিয়াছে। এইবার অবশিষ্ট জীবনের শেষ সময় উপস্থিত। একদিকে ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যাহা সাধ্য, তাহা করিলেন, তাহার পরে আবার এই একাহার, দ্ব্যাহিকাহার, ত্র্যাহিকাহার, কচ্চাশাকাহার, কুমুদ-নালাহার, পত্রাহার এবং কখন বা তাহারও

অভাব হইয়া সপ্তাহ, অষ্টাহ ধারাবাহী অনাহার চলিতেছে, জীবন আর কতদিন থাকিবে?—কেমন করিয়া থাকিবে? এই দেখ, আমার নিজ দেহের অবস্থা! আহার-ব্যসনের দ্বারা রক্ত-মাংস রসধাতু বিশুষ্ক হইয়া কঙ্কালমাত্রে উপনীত হইয়াছে। এই দেখ, আমার শরীরের সমস্ত শিরা-ধমনী, রজ্জুর ন্যায় স্ফুটিত হইয়াছে, ইহাদিগকে একে একে গণনা করা যায়। এই দেখ, বক্ষাস্থির অবকাশে ফুস্‌ফুস্ ও হৃৎপিণ্ডের পরিস্ফুরণ দৃষ্ট হইতেছে, কশেরুকা আর পঞ্জরাস্থিগুলি নারিকেল-বাগুরার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গুলি উপযুক্ত ক্রিয়ায় অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। হস্ত-পদাদি ক্রমে অবসন্নপ্রায় হইল, আর কয়েকদিন এরূপ থাকিলে, বোধ হয়, চলিতেই পারিব না। তা হউক, তাহাতেও দুঃখিত নহি, কিন্তু দৈনন্দিন সন্ধ্যাবন্দনাদিক্রিয়াতে যে অসামর্থ্য হইল এবং আহ্নিকের একখানা নৈবেদ্য যে সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না, প্রতিদিন কেবল কচী-শাকের ভোগ দেওয়াও ঘটিতেছে না, ইহাই আমার নিতান্ত অসহনীয় যন্ত্রণাবহ হইয়াছে। বোধ হয়, এই কারণেই সত্বর এ দেহ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তৎপরে, অপর সাধারণের অন্নব্যসনও, আমাকে নিজব্যসন অপেক্ষায় অধিকতর ব্যথিত করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমি কোনরূপেই শান্তি পাইতেছি না। তাই শীঘ্র শীঘ্র এই ভগ্নদেহটা নিঃস্পন্দ হইলেই এখন আপেক্ষিক সুখ বোধ করি। ঐ দেখ, ফরিদপুর, ঢাকা এবং বরিশাল প্রভৃতি স্থানীয় লোকগুলির সুদারুণ অন্ন-ব্যসন-জাত অবস্থা! উহারা আমা অপেক্ষাও অধিকতর ব্যসনাপন্ন হইয়া আত্মঘাতী হওয়া-

কেও শান্তির উপায় স্থির করিতেছে, এজন্য কেহ জলে, কেহ বা উদ্বন্ধনে দেহযাত্রার শেষ করিতেছে, কেহ বা অন্য কোন মৃত্যুপায়ের অন্বেষণ করিতেছে। তিন চারি দিন যাবৎ অনাহারে ম্রিয়মাণ শিশু সন্তান-সন্ততির আর্ত্তনাদ শুনিয়া, সাক্ষাতে সেই অবস্থা দেখিয়া, তাহার প্রতিকারে অসমর্থ হইলে, কোন্ পিতামাতার প্রাণ দেহে থাকিতে পারে? ঐ দেখ, ঐ শিশুগুলির অবস্থা! উহাদের মুখখানির প্রতি, আর পেটটার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর! হৃদয়! আমি আর বলিতে পারিতেছি না, বলিতে আমার বাক্য সরিতেছে না, যেন মূর্চ্ছার ন্যায় অবস্থা হইয়া উঠিল। উহ! আর বর্ণনার প্রয়োজন নাই। তুমি নিজ হইতেই দেখিয়া শুনিয়া সমভিজ্ঞ হও। এখন বল দেখি, সেই মা বাঁচিয়া আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় কি না? কোটি কোটি অসুরগণ একত্র হইয়া যাহার সুপর্য্যাপ্ত একটি গ্রাসও হয় নাই, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডগুলি উদরসাৎ করিতে যাহার নিমেষার্দ্ধ লাগে না, যাহার কটাক্ষপাতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতে পারে, সেই মায়ের জীবন বর্ত্তমান থাকিলে এই তুচ্ছ বিপদে, তুচ্ছ নৃশংসগণের অত্যাচারে আমাদের এরূপ দশা হইতে পারে কি? যে মা স্বয়ং অন্নপূর্ণা, অন্ন যাঁহার অন্য মূর্ত্তি-মাত্র, সেই মা বাঁচিয়া থাকিতে "হা অন্ন, হা অন্ন" বলিতে বলিতে এই বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতীগণ অনাহারে নয়ন মুদ্রিত করিতে পারে কি?—তাহা কখনই নহে। তাই বলি, মা আর জীবিতা নাই, আমাদের মায়ের মৃত্যু হইয়াছে। অতএব, হৃদয়! তুমি শান্ত হও, স্থির হও, "মা আসিবে—মা আসিবে" বলিয়া আর ব্যাকুল হইও না।

অবশেষে বলি, যদি একান্তই এ কথা বিশ্বাস না কর, মা আছে বলিয়াই নিশ্চিত ধারণা থাকে, তাহা হইলেও যে তাহার চক্ষুঃ-কর্ণাদি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়াছে, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না। মায়ের সেই চক্ষুও নাই, কর্ণও নাই। সেইজন্য আমাদের কোন কিছুই দেখিতে পায় না এবং প্রাণোচ্চাটনকারী এই আর্ত্তনাদও শুনিতে পায় না। গর্ভজাত সন্তান-সন্ততির এইরূপ ব্যসন-বিড়ম্বনায় প্রাণাত্যয়াবস্থা দেখিলে, আর এই আর্ত্তনাদ শুনিলে মায়ের প্রাণ কখনই নিশ্চল থাকিতে পারে না। তাই বলি, মা থাকিলেও তাহার চক্ষুকর্ণাদি নাই। তবে আর তাহার জন্য এত ব্যাকুল হইয়া ফল কি? সে ত তোমার আহ্বানাদি কোন কিছুই দেখিবে শুনিবে না?

যদি এ কথাও তোমার শ্রদ্ধাস্পদ না হয়, তবে তাহার শক্তির অভাব-বিষয়ে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতে হইবে। মা জীবিতা থাকিলেও, তাহার চক্ষু-কর্ণ থাকিলেও, তাহার শক্তি-সামর্থ্য নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই বিড়ালাক্ষ-প্রমর্দ্দক, মহিষাসুর-প্রশমক, চণ্ডমুণ্ড-বিঘাতক, রক্তবীজ-নিপাতক, শুম্ভনিশুম্ভ-প্রমাথী, শক্তিপর্ব্বত নিশ্চয়ই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পরমাণুরূপে পরিণত হইয়াছে, এখন আর তাহার চলৎশক্তিও নাই, সুতরাং আসিবারও সম্ভাবনা নাই। তাহা থাকিলে, সন্তানগণের এরূপ ব্যসন দেখিয়া শুনিয়া কোনমতেই মায়ের প্রাণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। অতএব, তাহার আসিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হওয়া নিতান্তই নিষ্ফল।

ভ্রাতঃ, হৃদয়! এ কি হইল! তুমি যে কোন কথাই বিশ্বাস করিতেছ না! প্রাণসখ! আমি এত ব্যগ্রতা, এত আগ্রহসহকারে

যত প্রবোধ দিতেছি, সমস্তই যে সমূলে উৎক্ষিপ্ত করিতেছ! ভাই! আর যে সহ্য করিতে পারি না। তোমার অশান্তিই যে এ হতভাগার ব্যসন-পীড়িত মুমূর্ষু জীবন নিঃশেষে নিমীলিত করিল! ভাই! তুমি কি জন্য আমার প্রতি এত অবিশ্বাসী হইলে? কি জন্য আমার প্রাণবন্ধু হইয়া প্রাণরিপু হইলে? আমার কথা বিশ্বাস কর, যাহা বলিয়াছি, তাহা গ্রহণ কর। মা নিশ্চয়ই জীবিতা নাই, নিতান্ত পক্ষে থাকিলেও তাহার চক্ষুঃ কর্ণ নাই, আর তাহাও যদি অস্বীকার কর, তবে তাহার কোন শক্তি সামর্থ্য নিশ্চয়ই নাই। অন্ততঃ যদি তাহাও তোমার প্রত্যয়স্থ না হয়, তবে তাঁহার সেই হৃদয়ভরা দয়া স্নেহের অভাব-বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া নিশ্চিন্ত থাক। মা সর্ব্বেন্দ্রিয়-সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা হইয়া জীবিতা থাকিলেও, তাহার সেই মায়া মমতা দয়া স্নেহাদি গুণ-গুলি নিশ্চয়ই অন্তর্হিত হইয়াছে। যে দয়া-স্নেহের দ্বারা সে সুর-গণকে অসুর হইতে, ঋষিগণকে রাক্ষস হইতে এবং অবশেষে সেদিন শ্রীমন্তকে মশান হইতে রক্ষা করিয়াছিল, তৎসমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং তুমি আত্মহত্যা করিলেও তাহাকে এ পাপময়ী পৃথিবীতে আনিতে পারিবে না। অতএব আর ব্যাকুল হইও না, আমাকে অসহনীয় যাতনানলে দগ্ধ করিও না।

হৃদয়! সর্ব্বশেষে তোমায় আর একটী কথাও স্মরণ করিয়া দিই। তুমি উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ই যদি অবিশ্বাস কর, তবে এ কথাটী স্মরণ হইলে আর কোনই আশা-ভরসা থাকিতে পারিবে না। সুতরাং কোন উদ্বেগ-যন্ত্রণা অভিভূত করিতে সমর্থ হইবে না।

স্মরণ করিয়া দেখ, সেই গত বৎসরের ঘটনা। সেবারে,—সেই

ভাদ্রমাসেই, হরি-বিরিঞ্চি-শিবপ্রমুখ সমস্ত সুরগণ সবেৃত হইয়া অবধারণ করেন, "এ পাপময় নরকাগার ধরণীগর্ভে মাকে আর আসিতে দেওয়া হইবে না।" এখানে কত নগর-নগরীর অসংখ্য দুরাশয় নরাধম নরপশুগণ মায়ের পূজাচ্ছল করিয়া কত কদাচার, কত ব্যভিচার, কত অত্যাচার করে, তাহা তাঁহাদিগের সহ্য হয় না। "দুর্গা দোকান," দুর্গা ফাঁদ," "দুর্গা জাল," "দুর্গা বড়িশ," ইত্যাদি কতরূপের অভিনয় করিয়া কত নরপশুগণ কতপ্রকার পশূচিত স্বার্থসাধন করে, ইহা তাঁহারা দেখিতে চাহেন না। তাই মাকে নিতান্ত অনুরোধে আবদ্ধা করিয়াছিলেন, "মা! আর পৃথিবীতে যাইতে পারিবেন না।" পরে মাও তাঁহাদের ভক্তি-সম্বলিত আগ্রহে বাধ্যা হইয়া এখানে আর না আসাই স্থির করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রাণাধিক দুর্গাশরণের সেই প্রাণাত্যয় ঘটনা উপস্থিত হইলে যখন আইসেন, তখন বলিয়াছিলেন, "দুর্গাশরণ! এবার আমি তোমারই অনুরোধ প্রতিপালন করিলাম, কিন্তু সেই সর্ব্বভূত-পূজনীয় আমার প্রিয়তনয় বিধি বিষ্ণু প্রমুখ দেবগণের তাদৃশ তীব্র নির্ব্বন্ধ আমি প্রতিবারে উপেক্ষা করিতে সমর্থা হইব না; অতএব তুমি এইবারই আমার শেষ আগমন বলিয়া অবধারিত কর।" ইহাই সেই মায়ের কথা, তৎপর সে দিন শ্রীমান্ গণপতি ভায়াও আমাকে স্বপ্নাবস্থায় সেই কথারই স্মরণ করিয়া দিয়াছেন। হৃদয়! মা আমার জীবনসম্বল হইলে কি হইবে? আমি ত তাহার সম্বল নহি, প্রিয়পুত্রও নহি, ভ্রাতা দুর্গাশরণের মতও নহি, তবে মা আমার অনুরোধ শুনিবে কেন?—মা আসিবে কেন? মা ত্রিলোকপতি হরিহরব্রহ্মার সহস্রার-বিলাসিনী, তাঁহাদিগেরই আদরিণী, তাঁহারাই মায়ের পুত্রের উপযুক্তও

বটেন, প্রিয়পুত্রও বটেন, নরকের কীট ভোলাদাস তার কি? ভোলাদাসের কান্না-কাটী কোন্ কাজে লাগিবে? বাস্তবিকও, মা আসিবেই বা কেন? ত্রিদিবশির-কৈলাসবিহারিণী মা, এই নরক-কুণ্ড ধরণীতে আসিবেই বা কেন? সুধাপায়িনী মা তোমার কি জন্য আগমন করিবে? মায়ের শ্রীমুখের তুলনায় সুধাই নিদাঘের মধু, আর শ্রীপদের নিকটে অমরাবতীই সৈকতময়ী ভূমি, তবে এ ছার পৃথিবীতে কোন্ সাধে মা আসিবে? হউক্, তথাপি এ পৃথিবীর সম্রাট্‌ভবনেও কি সেমত কিছু আছে,সেমত পূর্ণধাম আছে,না অমরাবতী আছে, কিম্বা সেই সুধাবিন্দুই আছে? এখন দেখ দেখি প্রাণ! তোমার নিজের অবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টি কর দেখি! তোমার তো তৃণময় মণ্ডপখানিরও তিন চাল মাত্র অবশিষ্ট আছে! ভোজনেও কচ্চীশাক ঘটিতেছে না, তবে বল দেখি, মা কোথায় আসিবে, কি খাইবে, আর আসিলে কিম্বা খাইলেই বা তুমি কোন্ প্রাণে মাকে এখানে বসাইবে, আর কচ্চীশাক খাওয়াইবে? তবে মা আসিবে কেন? এবার মায়ের আসা সম্বন্ধে অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই। উল্লিখিত নরাধমগণও কদাপি সেই সকল কুব্যবহার পরিত্যাগ করিবে না, বিধি বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণও সন্তুষ্ট হইবেন না, তাঁহাদের সহস্রার-বিলাসিনী মাকেও এই নরককুণ্ডে ছাড়িয়া দিবেন না, মাও সেই সর্ব্বারাধ্য পুরুষোত্তমপ্রমুখ প্রিয়তম তনয়-গণের মমতায় শৈথিল্য করিতে সমর্থা হইবেন না, আসাও ঘটিবে না। অতএব ভ্রাতঃ! তুমি শান্ত হও, সুদৃঢ় ধৈর্য্য-নিগড়ে সন্নদ্ধ হও, মিথ্যা আশায় স্ফীত হইয়া আমাকে উচ্চলিত করিও না।

আরও দেখ, তুমি যে, "মা মা" বলিয়া এত ব্যাকুল হইয়াছ, তাহার প্রয়োজনও অতি অল্প। এখন মা আসিয়া আর আমার

কি করিবেন, না আসিলেই বা আর অধিক কি হইবে? যাহা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা তো অধিক কিছুই নাই! দুর্গম সঙ্কট-মধ্যে পরিগণিত যাহা কিছু আছে, সমস্তই তো আমার ঘটিয়া গিয়াছে, এখন মৃত্যুদশাও উপস্থিতা, তবে আর ভয় করিব কিসের? কিসের জন্য এত চিন্তান্বিত হইব? "অশনেঃ পতনে ন বেদনা, পতনজ্ঞানমতীব দুঃসহম্"—বজ্র পড়িবে বলিয়াই দুঃসহ ভয় হইয়া থাকে, কিন্তু পড়িয়া গেলে তো শেষ হইয়াই গেল! শেষে আর বেদনাই বা কি, আর ভয়ই বা কি? তদ্রূপ আমা-রও এখন কোন চিন্তাও নাই, কোন ভয় ও নাই। এখন যদি কোন নব বিপদের সঙ্ঘর্ষণ হয়, তাহা বিপদ বলিয়াই পরিগণিত হইবে না। ভাবিয়া দেখ, সেই দিন সেই একে একে, সেই প্রাণের পুত্তলী পুত্রদ্বয়কে আমার পঞ্চপ্রাণ দশেন্দ্রিয়ের সহিত শ্মশানানলে সমর্পণ করিয়াছি! তন্মধ্যে সেই নবনীতময় চাঁদ দুটী নিরবশেষে দগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এ হতভাগার সেই অতি কর্কশ পঞ্চপ্রাণ দশেন্দ্রিয় আজও একেবারে ভস্মীভূত হইতে পারিল না। ইহাদের মধ্যে যে কি দুর্দ্দহ পদার্থ আছে, তাহা জানি না। সেই শ্মশানানলে ইহারা এত দীর্ঘকাল যাবৎ দহ্যমান হইয়াও নিঃশেষে ভস্মসাৎ হইল না। তৎপরে, সেই প্রাণপ্রতিমা কন্যা দুটীও পূর্ব্বেই অদৃশ্যা হইয়াছে। তবে এখন বাকি ছিল—দেহ, তাহাও নানাবিধ বায়ুরোগ, পিত্তরোগ ও কফরোগদ্বারা কবলিত হইয়া, তাহাদের করাল দংষ্ট্রায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে; পরে সেই শ্মশানের মত শূন্যময় কুটীরাশ্রমটাও বর্ত্তমান বন্যার দ্বারাই যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। অবশেষে বণিক্‌গণের বাণিজ্যে জীবের অবশিষ্ট প্রাণের সহিত ধান্য তণ্ডুল

কয়েকটি অন্তর্হিত হইলে এখন অন্নাভাবে মুমূর্ষু দশায় উপনীত হইয়াছি, মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তির তর্জ্জন গর্জ্জন সমস্তই দর্শন করিতেছি, পীড়নও অনুভব করিতেছি। এখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল; বোধ হয়, অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। এখন সেই দন্দহ্যমান প্রাণবায়ু এই চূর্ণ-বিচূর্ণিত দেহভাগ পরিত্যাগ করিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এখন বল দেখি ভাই! ইহার পরে আর কি হইতে পারে? কিছুই তো নয়! তাই বলি, এখন গা এড়িয়া দিয়া থাক; যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক; আমার আর বিপদ বোধও নাই, তাহার কোন ভয়ও নাই, মা আসিবারও কোন প্রয়োজন নাই, তন্নিমিত্ত কোন ভাবনা চিন্তারও আবশ্যক নাই। এস ভাই! এখন নয়ন নিমীলিত করিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকা যাউক।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

ভোলাদাস।—হায়! এ আবার কি হইতে লাগিল! এ যে ততোধিক বিপদ! এবার বুঝি প্রকৃতই ঘোর সঙ্কটের শেষ সময় উপস্থিত! সত্যই বুঝি ভগ্নদেহটা প্রাণের ভার বহনে অসমর্থ হইয়াছে! সেই কতদিন হইতে কত করিয়া, কতরূপ বলিয়া, অবোধ মনটাকে একরূপ প্রবোধ দিয়াছিলাম; এখন যে, নিজেই যেন কেমন কেমন হইলাম! নিজেই যে, অধীর হইতে বসিলাম! এবার কোন্ উপায়ে কেমন করিয়া শান্তি করিব! কেমন করিয়া পরিত্রাণ পাইব। মনকে বলিলাম, "এ সেই শরৎকাল নয়," কিন্তু আমাকে আমি কি বলিয়া তাহা বুঝাইতে পারিব? এ যে, সেই

আশ্বিন মাসের সমস্ত লক্ষণাবলী প্রস্ফুটিত হইয়া আমাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে! সেই সুপরিষ্কার গগনমণ্ডল, নিরাবিলা রজনী বনিতার সহিত সমবেত হইয়া মায়ের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন, প্রস্ফুটিত নক্ষত্র-পুষ্পাঞ্জলি হস্তে লইয়া মায়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। রাত্রিদেবী প্রত্যূষে সেই চন্দ্রামৃত-সম্বলিত বস্ত্রদ্বারা পৃথিবীর গাত্র মার্জ্জন করিয়া মাঙ্গল্য-শ্রী সংবর্দ্ধিতা করিতেছেন। সূর্য্যদেব, ধীরে ধীরে সেই অতি গাঢ়তর খর রশ্মি সংযত করিতেছেন। দেবরাজ বর্ষণকারী জলদজাল প্রতিসংহৃত করিয়াছেন এবং উর্দ্ধাকাশে অভ্রের শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া মায়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। নদ-নদীগণ নিজ গাত্রসহ পৃথিবীমণ্ডল বিধৌত করিয়া নির্ম্মল পবিত্র বেশ ধারণ করিয়াছে। সুধাকর আনন্দোৎফুল্লমুখে নিরাবিল প্রভামালার সংবর্দ্ধনায় পৃথিবীকে সমাশ্বস্তা করিতেছেন। এইরূপে সকলেই সেই শারদ বেশে সুসজ্জিত হইয়া শরৎকালের, আশ্বিন মাস সমাগম ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব আমি কেমন করিয়া বুঝিব, এ সেই শরৎকাল নয়, আশ্বিন মাসও নয়?

তৎপরে যাহা কিছু মনকে বলিয়াছি, তাহার কোন কিছুই তো আমার আত্মাতে স্থান পাইতেছে না! মায়ের দয়া, মায়া আছে কিনা, আত্মা তাহা বুঝিতে চায় না। মায়ের আসার ফলাফলও শুনিতে চায় না, আসিবার সম্ভব অসম্ভবও মানিতে চায় না! নিজের শক্তি সামর্থ্যও ভাবিতে চায় না। চায় কেবল মাকেই দেখিতে, মাকেই ভাবিতে। এখন কি উপায় করিব, কেমন করিয়া সংপ্রবুদ্ধ হইব! মা বিনা যে, অধীর হইয়া পড়িলাম! জীবন অন্ধকারময় হইল! ইন্দ্রিয়গণ নিরালম্ব হইল!

পঞ্চপ্রাণ শূন্যময় হইল! হৃৎপিণ্ড রুধিরশূন্য হইল! এখন যে জীবন গেলেই রক্ষা পাওয়া যাইত! কিন্তু কৈ; তাহাও তো যায় না,—এত কামনা করিলেও তো যায় না! মাও ত আসিবার নহে, কোন কথা শুনিবারও নহে। তবে যদি, শীঘ্রই এই কষ্ট-জীবন শেষ করার নিমিত্ত কান্নাকাটী করিলে তাহা সাধন করিয়া দেয়, সেইরূপ একবার চেষ্টা করিলে পারি। ইহাতে, বোধ হয়, মায়ের কোনই ইষ্টানিষ্ট নাই, তাহাকে আসিতেও হইবে না, যাইতেও হইবে না, কেবল একটু ইচ্ছার প্রয়োগ করা আবশ্যক; সুতরাং ইহা সিদ্ধ হইলেই পারে। নতুবা আত্মঘাতী হইলে যে চিরদিন পিশাচ-রাজ্যে বাস করিতে হইবে! যাহা হউক, অগ্রে একবার কাঁদাকাটী করিয়া দেখি! যদি কোন ফল না হয়, তবে অগত্যা পৈশাচ-যোনির ভয়ই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

মাগো! ওমা! মা! আমি সেই গতবারের হতভাগা ভোলা-দাস। মাগো! আমার কোন অভাব নাই, কোন বিপদ নাই. সঙ্কট নাই, কোন কিছু কামনাও নাই, তোকে আর আসিতেও বলিব না, কেবল একটা সামান্য কথা শুনিতে প্রার্থনা করি। মা! তুই আমার একটি অনুরোধ প্রতিপালন কর্। এই শেষ সময়ে হতভাগা ভোলাদাসের একটি কথা শোন্। তা এমন অভি-নব কোন কার্য্য করার জন্য নহে, কোন কষ্ট-সাধ্যও নহে, যাহা সকলেরই হইয়া থাকে, আমারও নিশ্চয়ই হইবে এবং অন্যো-পায়ের দ্বারাই প্রায় হইয়া আসিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করা। মাগো! ওমা! মা! আমার এ দেহটা ধারণ করা নিতান্তই যন্ত্রণাবহ হইয়াছে, নিতান্তই অসহ্য হইয়াছে, আমি কোনমতেই ইহা বহন করিতে সমর্থ নহি। ইহা যদিও অন্যান্য কারণে প্রায়

শেষ হইয়াছে সত্য, কিন্তু যেটুকু আছে, তাহা কোনরূপেই যাই-তেছে না; তাই তোর নিকট প্রার্থনা, তুই প্রেতরাজকে একটু বলিয়া দে, তিনি কা'লকার দিনের (সপ্তমী পূজা দিনের) পূর্ব্বে ইহাকে কোন উপায়ে স্বায়ত্ত করুন। মাগো! দোহাই তোর ঐ পা দুখানির, দোহাই তোর নামের! তোর গর্ভগত হতভাগার এই কথাটা শোন্। তোকে আসিতেও হইবে না, যাইতেও হইবে না, কিছু দিতেও হইবে না, লইতেও হইবে না, কেবল এই কথাটা শোন্। মা! তুই যদি আমার মাও না হইস্, তথাপি জগদম্বা বটে, আমি যদি জগতের মধ্যে কিছু হই, তবে কোটী অংশক্রমে আমার মা বলিবার কিঞ্চিৎ অধিকার আছে, তাই বলি, মা! জগন্মাতা! আমি বড়িশের মত এই দেহটাকে ধারণেও সমর্থ নহি, মোচনেও সমর্থ নহি, অতএব তুই আমার এই কথাটা রাখ্।

ইহার সঙ্গে আর একটী গুরুতর প্রার্থনাও আছে। তাহা এটি অপেক্ষাও আমার প্রয়োজনীয় বিষয়, কিন্তু তোর পক্ষে কিছুই নহে, তুই মনে ভাবিলেই তৎক্ষণাৎ নিষ্পন্ন হইবে। মাগো! এই যে, সহস্র সহস্র বালক-বালিকাগণ আহারাভাবে মুমূর্ষু শয্যায় শায়িত হইয়া ক্ষীণস্বরে, দীনভাবে মাকে ডাকিতেছে, "মা! গেলাম, মা! গেলাম, ক্ষুধায় পেট পুড়িয়া গেল, আর বাঁচি না, এখন উঠিতেও পারি না, শুইতেও পারি না, মা! খেতে দে, মা! ভাত দে, আর বলিতেও পারি না, মা! ভাত দে, মা! ভাত দে" ইত্যাদি নানাবিধ আর্ত্তনাদ করিতেছে। আর যে সকল বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতীগণ ঐরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া—"দুর্গে! দুর্গতিহরে! মাগো! অন্নপূর্ণে! তুমি কোথা আছ? আর যে

সহ্য হয় না, জঠর-যন্ত্রণায় যে ভস্মীভূত হইলাম! মাগো! একবার কটাক্ষপাত কর্” ইত্যাদি বিলাপ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়াছে, তাহাদের সমস্ত যন্ত্রণা, সমস্ত বেদনা, সমস্ত দুঃখ, তুই আমার দেহে সংক্রামিত করিয়া দে; সেই শিশু বালক বালিকাগণ, বৃদ্ধবৃদ্ধাগণ সকলেই নিরাপদ হউক, নির্যন্ত্রণ হউক, সেই সুদারুণ জঠরাগ্নি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার দেহে উপস্থিত হউক, তাহারা “জয় দুর্গা, জয় দুর্গা” বলিয়া গাত্রোত্থান করুক। তাহা হইলে আহারাভাবেও তাহাদের কোন বিপদ থাকিবে না, তোকেও কোন কষ্ট করিতে হইল না।

আমার এই উভয় কামনা-পূরণে যদি তোর একান্তই কার্পণ্য বা অপ্রবৃত্তি হয়, ইহার একটি মাত্র দিতে ইচ্ছা হয়, তবে এই শেষোক্ত কার্য্যটিই শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন কর্। মাগো! আমার এই মুমূর্ষু দেহধারণ অপেক্ষা শেষোক্ত যন্ত্রণাই অধিকতর অসহনীয় হইয়াছে। তাই বলি, মা! সকলের জঠরাগ্নি আমার দেহে সংক্রামিত কর্।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

ভোলাদাস এইরূপ বহুবিধ বিলাপ, বহুবিধ কাঁদাকাটা করিলেন, কিন্তু কোন অভিলাষই পূর্ণ হইল না, মায়ের কোন প্রত্যুত্তরও জানিতে পাইলেন না, মা ইহা শুনিলেন কি না তাহাও বুঝিলেন না। এদিকে আজ সপ্তমীপূজার দিন। পূজার সময়ও উপস্থিত। ভোলাদাস, মায়ের আগমনে একবারে নিরা-

শ্বাস হইয়াও আত্মার আবেগে স্থির থাকিতে পারেন নাই। মায়ের পূজার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাই সেইরূপ ম্রিয়মাণ অবস্থায়ও কুম্ভকারের বাড়ী গিয়াছেন, বিবিধ অনুনয় বিনয়ে তাহাকে বাধ্য করিয়াছেন, একখানি প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, সেই ভগ্ন গৃহেই তাহা স্থাপন করিয়াছেন এবং অতিকষ্টে ভিক্ষাদির দ্বারা কিঞ্চিৎ তণ্ডুলাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পূজার উদ্যোগ করিয়া পূজাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, সংস্কৃত মন্ত্রপাঠে মাকে আহ্বানও করিতেছেন। কিন্তু পূজার মুখ্যকাল প্রথম দশদণ্ড প্রায় অতীত হইয়া চলিল, মায়ের কোনই সাড়াশব্দ নাই। তাই এখন সেই পূর্ব্বকথা (মার আর না আসিবার কথা) স্মরণ করিয়া অন্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

ভোলাদাস।—হায়! আমি কি সত্য সত্যই পাগল হইয়াছি! সত্যই কি আমার জ্ঞান ধ্যান সমস্ত লুপ্ত হইয়াছে? আমি এ কি করিতেছি! কি নিমিত্ত প্রাণান্ত করিয়া এ সমস্ত উদ্যোগাদি করিলাম, কি জন্যই বা পূজায় বসিলাম, কেনই বা এত আহ্বান, এত মন্ত্রপাঠ করিলাম, মা তো আসিবে না নিশ্চয়ই! সে তো আমার সেই দুটো কথাও শুনিল না, একবার উত্তরও দিল না, তাহার পরে আবার এ সমস্ত কি? এই সমস্ত করিয়া, এখন যে আরও অসহনীয় যন্ত্রণা হইল, আর তো কোন মতেই সহিতে পারি না! এখন সেই সপ্তমীর সময় প্রায় অতীত হইয়া গেল, আর তো মা-শূন্য প্রাণ রাখিতে পারি না! এ যাতনা তো আর বহিতে পারি না! এখন কি উপায় করিব, কোথায় যাইব! কেমন করিয়া শান্তি পাইব! এখন যে, সেই পাপ আত্মহত্যা ব্যতীত আর

কাহাকেও আমার বন্ধু বলিয়া দেখিতেছি না! এখন কি তাহারই আশ্রয় লইতে হইল! সেই প্রেতরাজ্যই বৃদ্ধি করিতে হইল! হউক, প্রেতযোনি ভূতযোনি, যাহা ইচ্ছা হউক, এখন আর সে ভয়ের অবকাশ নাই, বর্ত্তমান যাতনাই এখন গুরুতর বিষয়, অতএব তাহাই করিব। সখি! আত্মহত্যে! এ হতভাগা ভোলাদাস তোমারই অনুসরণ করিল, তোমাকেই শরণ হইল। তুমি ইহাকে দারুণ যন্ত্রণা হইতে পরিমুক্ত করিও।

এই বলিয়া পূজাস্থান হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অতি সন্নিহিত সেই ঘোরতরা পদ্মানদীর বেলাস্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই প্রবলবেগশালী অগাধ জলের উপান্তে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন। এদিকে,সেই সপ্ত-স্বর্গের চূড়ামণি কৈলাসধামে মায়ের আগমন-বিরোধি দেবসভা-মধ্যবর্ত্তী সেই ত্রৈলোক্যজননীর সিংহাসন যেন কম্পিত হইতে লাগিল, মায়ের শ্রীমুখমণ্ডল হইতে স্নেহময় ঘর্ম্মবিন্দু স্যন্দিত হইতে লাগিল, সেই ত্রিলোচনার লোচনত্রয় অন্যমনস্কতার ব্যঞ্জনা করিয়া স্থিরবৎ সংস্থিত হইল। সভাস্থ দেববৃন্দ তাহার কারণ বুঝিতে পারিয়া, মায়ের প্রসন্নতা ও ধৈর্য্যসংস্থিতির নিমিত্ত পরিব্যগ্র হইলেন এবং ব্রহ্মাকে অগ্রসর করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উদাত্তস্বরে মায়ের গুণ-গরিমাদি প্রকাশক ঋগ্বেদীয় "দেবীসূক্ত" গান করিতে লাগি-লেন।

অপর দিকে, ভোলাদাস সেই গগনস্পর্শিনী তরঙ্গমালায় আত্মবিসর্জ্জন কালে, উর্দ্ধদৃষ্টি উর্দ্ধবাহু হইয়া সগদ্গদ কণ্ঠে, উচ্চৈঃস্বরে, বাষ্পাকুলিত-নেত্রে, শেষ সময়ের দুই চারিটি কথা বলিতে লাগিলেন :—

ভোলাদাস।—মাগো! ও মা! মা! জগজ্জননি! জগদম্বে! মা! এইবার শেষ সময়, সেই অনন্যগতি ভোলাদাসের—গত-সর্ব্বস্ব ভোলাদাসের—কেবল মাসম্বল ভোলাদাসের এইবার শেষ সময় উপস্থিত। মা গো! ও মা! জগদম্বে! এ হতভাগা সন্তানের শেষ কথাটা শোন্। মাগো! তুই কোথা আছিস্, হতভাগা ভোলাদাসের শেষ কথাটা শোন্! মা! আমি আর কিছুই চাই না, কিছুই কই না, তোকে এ পৃথিবী স্পর্শ করিতে বলিব না, সেই যমকেও কিছু বলিতে হইবে না, কাহারো জঠর-যন্ত্রণারও, তোকে কিছু করিতে হইবে না, কোন কিছুই না, কেবল একটা কথা শোন্! মাগো! ও মা! মা! আমি সেই প্রাণের পুতুল তনয়দ্বয়, সুবর্ণ-প্রতিমা কন্যাদ্বয়হারা হইয়াও কথঞ্চিৎ জীবিত ছিলাম। তৎপরে ইন্দ্র, বরুণ ও বায়ুর সেই খণ্ডপ্রলয়-প্রতিম বন্যা-বাত্যায় ভাসিতে ভাসিতেও এ পাপ জীবনের একেবারে শেষ হইতে পারে নাই, ছয় মাসের অনাহার-ব্যসনে বাড়ববৎ প্রজ্বলিত জঠরানল, রক্ত মাংস, ধাতু রসাদি সমস্ত দগ্ধ করিয়াও, দেহটাকে চলৎশক্তিরহিত কঙ্কালমূর্ত্তি করিয়াও এ জীবনটা ভস্ম করিতে পারে নাই, অমাবস্যার চন্দ্রের ন্যায় ক্ষয়াবশেষ কিঞ্চিন্মাত্র অদ্যাপি অবশিষ্ট ছিল; তৎপর সর্ব্বোপরিস্থিত, অন্নব্যসনাপন্ন সেই বালক বালিকাদির জঠর যন্ত্রণা প্রতিসম্বেদনও এ অদাহ্য জীবনকে নিশ্চিহ্ন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু এখন তোর আগমনাভাবের যন্ত্রণা কোনমতেই সহ্য করিতে পারিলাম না। ইহা সেই জীবনের দুর্দ্দহ অংশটুকুও নিঃশেষে ভস্মসাৎ করিল! তা হউক, সেজন্য তোকে আর ত্যক্ত করিব না, আসিতেও বলিব না, এই আমি নিজ হইতেই সমস্ত বিপদজাল কাটাইতে

প্রবৃত্ত হইলাম, এই গভীর জলবক্ষে উত্তোলিত সুদারুণ আবর্ত্তময় গগনস্পর্শি তরঙ্গমালার মধ্যে আমি এই পাপ দেহ বিসর্জ্জন করিলাম। এখন তোর নিকট কেবল এইটুকু প্রার্থনা যে,—আমার পঞ্চপ্রাণ নির্গম সময়ে আমার অন্তর্নয়নের সম্মুখে যেন নিমিষের জন্য তোকে দেখিতে পাই, আর "মা—মা!" বলিয়া যেন তাহা নির্গত হয়, ইহাই আমার একমাত্র কথা, একমাত্র কামনা। মাগো! ওমা! মা! আমার এই কথাটা রাখিস্, দোহাই তোর পা-দুখানির, দোহাই তোর নামের, আমার এই কথাটা রাখিস্, মাগো! ও মা! মা!—এই বলিতে বলিতে ভোলাদাস সেই তরঙ্গবক্ষে, ভক্তগণের আশা-ভরসার সহিত, তাহাদের প্রাণের সহিত নিপতিত হইয়া ক্ষণমাত্রে সর্ব্বলোকের অদৃশ্য হইলেন। দর্শকগণের গগনস্পর্শী হাহাকারে নদীতীর সংক্ষুব্ধ হইল, দশদিক্ অন্ধকার হইল, সূর্য্যালোক অন্তর্হিত হইল। এদিকে কৈলাসধামে অকস্মাৎ ভীষণ ভূকম্প হইয়া, কৈলাস টলমলায়মান হইল! "মাগো! ওমা! মা!" এইরূপ শব্দসম্বলিত বজ্রসদৃশ একটা বিদ্যুৎ উপস্থিত হইয়া দেবগণের জীবনালম্বন—তড়িৎ শক্তি অপহরণ করিল, তাঁহারা যিনি যেরূপে ছিলেন,সেই অবস্থায়ই চিত্র পুত্তলীবৎ সংস্থিত রহিলেন। তখন কৈলাসের কৌমুদী হঠাৎ নির্ব্বাপিতা হইল, কৈলাস অন্ধকারময় হইল, কৈলাস কৈলাসেশ্বরী পরিশূন্য হইল। অমনি "সাবধান—বরুণ! সাবধান! আমার তনয়,—সাবধান! বাবা! ভয় নাই, ভয় নাই, ভোলাদাস! ভয় নাই, এই আমি আসিলাম, কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম, সমস্ত দেবগণের নির্ব্বন্ধানুরোধ উপেক্ষা করিয়া পৃথিবীতে আসিলাম, তোমার নিকটে আসিলাম, বাবা! নয়ন উন্মী-

লন কর, এই আমি তোমার মা, তোমার নিকট আসিলাম, তোমাকে কোলে করিয়া বসিলাম, ত্রিভুবনে কাহার সাধ্য, আমার তনয়ের অপকার সাধন করিবে! এই তোমার সমস্ত বিপদজাল বিদূরিত হইল, দৈবভয়, দস্যুভয় অপনোদিত হইল, দুর্ভিক্ষযন্ত্রণা নিঃশেষিতা হইল, মুমূর্ষু প্রজাগণ অচিরেই অনুপম কল্যাণ ভোগ করিবে”—এই বলিয়া সেই সিংহবাহিনী দয়াময়ী দশভুজা ভোলাদাসের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে উত্তো-লনপূর্ব্বক ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন এবং সুধানিস্যন্দি কর-কমল দ্বারা ভোলাদাসের অশ্রু সম্মার্জ্জন ও গাত্রাবমর্ষণ করিতে লাগি-লেন। কিন্তু ভোলাদাস কিছুই জানিতে পারিতেছেন না, তিনি বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য হইয়া অন্তরাত্মার দ্বারা মায়ের চরণসুধা পান করিতেছেন। তখন মা সেই অন্তরস্থ রূপের অন্তর্দ্ধান করি-লেন। অমনি “হা মা! হা মা!” বলিয়া ভোলাদাস নয়নোন্মীলন করিলেন। আর দেখিলেন, সেইখানে অপূর্ব্ব একটি জলময় প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে তাঁহার সেই হৃদয়ের বস্তু সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে হৃদয়ে করিয়া রাখিয়াছে এবং প্রাণের উজ্জীবক করামর্ষণের দ্বারা সান্ত্বনা করিতেছে, অশ্রুধারা মার্জ্জন করিতেছে। এইরূপ দেখিয়া ভোলাদাস মুহূর্ত্তকাল যাবৎ না সুখ, না দুঃখ, না চেতন, না অচেতন, না ভাব, না অভাব এইরূপ এক অনির্ব্বচনীয় অভূতপূর্ব্ব অবস্থায় থাকিলেন। অনন্তর মায়ের প্রতি ভক্তিমাখা অভিমানের সহিত সাশ্রুনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছুকাল আনন্দ ভোগ করিলেন। পরে মায়ের উৎসঙ্গ হইতে অবতরণ করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক মায়ের রাঙ্গা চরণ দুখানির তলে মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত মস্তকটি রাখিলেন।

অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া সজলনয়নে, হর্ষাভিমান—সগদ্গদকণ্ঠে মাকে বলিতে লাগিলেন।

"মাগো! ও মা! তুই কি আছিস্! তোর কি দয়া মায়া, শক্তি সামর্থ্যাদি কিছু আছে! তুই কি কিছু দেখিতে শুনিতে পাইস্!"

জগদম্বা।—বাবা! শান্ত হও, তোমার সমস্ত অভাব বিদূরিত হইয়াছে। আমি স্বয়ং দয়াময়ী, দয়া স্নেহাদি আমারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গস্বরূপ, তাহা সমস্তই সত্য। কিন্তু বাবা! আমাকে এ ভাবে না পাইলে, এ ভাবে না দেখিলে, সে প্রাপ্তি বা দর্শন কোন ফলপ্রদ হয় না। এইরূপে প্রাপ্তিই আমার প্রকৃত প্রাপ্তি এবং এইরূপে দর্শনই প্রকৃত দর্শন, ইহার দ্বারাই জীব কৃতার্থ হইয়া থাকে, তাই আমি এত কষ্টের পরে, এই ভাবে ভাবনার পরে মদর্পিতপ্রাণ ভক্ততনয়গণকে দর্শন দিয়া থাকি। সুতরাং ইহাও আমার দয়া স্নেহের কার্য্য। যাহারা অকস্মাৎ কিম্বা অত্যল্প প্রযত্নে আমাকে সন্দর্শন করে, তাহারা আমার দর্শনের প্রকৃত ফলপ্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব বৎস! তুমি নির্ব্বেদ পরিহার করিয়া শান্ত হও, আমাকে লইয়া নিজ কুটিরে গমন কর। এই আমি অন্তর্হিতা হইয়া তোমার সহস্রারে দৃশ্যরূপে অবস্থিতি করিলাম, পূজাকালে ধ্যান পুষ্পের আশ্রয়ে সেই প্রতিমায় অধিষ্ঠিতা হইয়া তোমার পূজা গ্রহণ করিব"।—এই বলিয়া মা বহির্দৃশ্যরূপ সম্বরণ করিয়া ভোলাদাসের সহস্রারে তাঁহার জ্ঞেয়রূপে অধিষ্ঠিতা হইলেন। ভোলাদাস আনন্দময়ীকে মস্তকে করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে ভাসিতে, আনন্দের তরঙ্গে হেলিতে হেলিতে, দোলিতে দোলিতে, জল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিজ কুটিরে প্রত্যাগত হইলেন এবং পতি-বিয়োগে বিমূর্চ্ছিতা সহধর্ম্মিণীকে সান্ত্বনা করিয়া সমস্ত

কথা আবেদন করিলেন। অনন্তর যথাশক্তি মায়ের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার এই ভাবে, এই নিয়মে পৃথিবীতে শ্রীশ্রীজগন্মাতার শুভাগমন হইল। প্রকৃত ভক্তগণ পরমানন্দে আনন্দময়ীর আরাধনা করিয়া চরিতার্থ হইলেন। পৃথিবী ধন্যা হইলেন। এখন আর একটি অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ শ্রবণ কর।

চতুর্থ তরঙ্গ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

১৮১৬ শকে কালীশরণ ব্রহ্মানন্দের দুর্গোৎসব।

ফরিদপুর জেলার অধীনতায় তারাপুর নামে একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। গ্রামটি বহুতর ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ভদ্রগণের আবাসস্থল। অন্যান্য জাতিরও অসদ্ভাব নাই। গ্রামের সমস্ত অধিবাসিগণই প্রায় স্বধর্ম্ম-পরায়ণ এবং সুসম্পন্ন অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু এই চারি বৎসর পরিব্যাপক সুদারুণ দুর্ভিক্ষের উৎপীড়নে তৎসমস্তই নষ্ট হইয়াছে। এখন সকলেই অতিদীন ভাবে কোন মতে জীবিত রহিয়াছে! এ অবস্থায় ধর্ম্মের অবস্থাও যেমন হওয়া উচিত তাহা অন্যথা হয় নাই।

এই গ্রামে ব্রাহ্মণ পল্লীর এক প্রান্তে কালীশরণ ব্রহ্মানন্দ নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিয়া থাকেন। কালীশরণ শাস্ত্র-রহস্য বোধে অতি নিপুণ এবং অধ্যাত্মবিদ্যাপঙ্কজের একটি মধুকর স্বরূপ। ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়েও ধার্ম্মিকগণের আদর্শ।

সুতরাং এরূপ লোকের, ইদানীং যেরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, ইহাঁরও তৎসমস্তই আছে। দিনান্তে একবার শাকান্ন ব্যতীত অন্য কিছু কখনই সংগৃহীত হয় না, পরিচ্ছদেও সপরিবারের শতগ্রন্থি সম্বলিত বস্ত্র, তাহাও আবার অঙ্গারের মত মলিন। গাত্রে তৈল নাই, মস্তকে তৈল নাই, বেতনাভাবে নাপিতও ক্ষৌর কার্য্য করে না, সুতরাং সেই অতিরুক্ষ, আলুলায়িত, সুদীর্ঘ শ্মশ্রু কেশ সমূহে সমাকুলিত গৌরবর্ণ মুখখানি হিমানী-মধ্যগত সৌর বিম্বের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুদীর্ঘ দেহদণ্ডটি অন্নকৃচ্ছে, প্রক্ষীণ হইয়া দীর্ঘ বাহু শাখা বিস্রংসনের দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের পতন চিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকে। বাটীতে দুই খানি কুটির মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাহাও জীর্ণ শীর্ণ ও ভগ্ন হইয়া লক্ষ ছিদ্রে পরিণত হইয়াছে। তাহার একখানি কুটির মায়ের মণ্ডপ, আর এক খানিতে নিজের অবস্থিতি এবং পাকাদি হইয়া থাকে। পরিবার মধ্যে পুত্র কন্যাদি সমস্তই জগদম্বা হরণ করিয়াছেন, এখন কেবল মাত্র সহধর্ম্মিণী অবশিষ্টা। দম্পতি উভয়েই প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন, শরীরের অবস্থাও উভয়েরই সমান। ইহাই কালীশরণের স্বাভাবিকী অবস্থা!

ইহার উপরি আবার বর্ত্তমান বৎসরের এই দারুণতম দুর্ভিক্ষ, আর ;প্রলয়প্রতিম বন্যা! এখন কালীশরণ মহাশয়ের অবস্থা সম্বন্ধে পাঠকের যেরূপ অনুমান হইতেছে তাহার কিছুই মিথ্যা হইবার নহে, তৎসমস্তই বাস্তবিক ঘটিয়া গিয়াছে। বন্যায়, প্রথমে বাটি, তৎপরে প্রাঙ্গণ বিপ্লাবিত করিয়া অবশেষে কুটীরের মধ্য পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে। কুটীরে বক্ষ মাত্র জল!

কালীশরণ তাহার উপরি বংশমঞ্চ করিয়া দিনযাপন করেন। মায়ের কুটীর খানি ঐরূপ প্লাবিত হওয়ায় জলমধ্যে শয়িত হইয়াছে! এদিকে আহার সম্বন্ধে, কোন দিন যবাগু, কোন দিন দ্বি ত্রি মুষ্টি অন্ন, কোন দিন কেবল কচ্চী শাক, না হয় কদলীসার (থোড়) মাত্রই ঘটিয়া থাকে। আবার অনেক সময়ে তাহাও সংগৃহীত হইয়া উঠে না। তখন কেবল জলের দ্বারাই দিবা রাত্রি অতিক্রান্ত হয়। এই অবস্থায় এবার সপরিবার কালীশরণ মহাশয় কালাতিপাত করিতেছেন। কিন্তু এ বিপদ, এ অন্নব্যসন তাঁহার অন্তরাত্মাকে অণুমাত্র বিত্রস্ত বা বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি অকাতরে অনন্যমানসে সর্ব্বদা মায়ের ভাবে মগ্ন রহিয়াছেন। সাশ্রুনয়নে, সগদ্‌গদ কণ্ঠে, রসোল্লসিতচিত্তে, মায়ের গুণাবলীসম্বলিত গানের দ্বারা তাঁহার বহিঃ প্রাণ, বাহ্যেন্দ্রিয় সর্ব্বদা সমাপ্যায়িত থাকে; অন্তঃকরণও সেই মৃত-সঞ্জীবনী সুধানিস্যন্দিনী মায়ের চরণ-চন্দ্রিকার মধ্যেই সতত বিলীন হইয়া থাকে। তাই কালীশরণের নিকট কোন বাধা বিপদ আস্পদ করার অবকাশ প্রাপ্ত হয় না।

এবার একক্রমে ছয় দিন পর্য্যন্ত কেবল মাত্র অলবণ কচ্চী শাক, আর কদলাসার ব্যতীত তাঁহার আহার সম্বন্ধে আর কিছুই ঘটিতেছে না, দেহযষ্টি একবারেই জীর্ণ হইয়া স্ব-ব্যাপারে অসমর্থ হইয়াছে। কিন্তু, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কালীশরণ মহাশয় এ সকল বাধা বিপদে পরিচালিত হয়েন না। তাই, এ অবস্থায়ও আজ, কালীশরণ সেই বংশ-মঞ্চের উপরি বসিয়া জীবনসঙ্গিনী অর্দ্ধাঙ্গিনীর নিকটে সানন্দে মায়ের গুণালাপ করিতেছেন। আলাপ করিতে করিতে, উভয়েই, কখনো

কাঁদিতেছেন, কখনো হাসিতেছেন, কখন বা বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া পতিত হইতেছেন, আবার উঠিতেছেন, আবার কখনো উভয়ে সমস্বরে মিলিত হইয়া "অহং রুদ্রেভিঃ" ইত্যাদি ঋগ্বেদীয় গান করিতেছেন।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

এদিকে, হরি-বিরিঞ্চি প্রমুখ সমস্ত সুরবৃন্দ সমবেত হইয়া কৈলাস ধামে সমুদ্গত হইলেন। সেখানে দ্বারস্থ গণপতিগণের সহিত যথাযথ সংকার গ্রহ প্রতিগ্রহে সম্ভাষণ করিয়া ত্রিলোক জননীর সিংহাসনের সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং সপ্তবার-প্রদক্ষিণান্তর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া সেই ত্রিভুবন-বিধাত্রীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন জগত্তারিণী তাঁহাদিগের প্রত্যেকের শিরোঘ্রাণাদি স্নেহ-ব্যঞ্জক মঙ্গলাচরণ করিয়া সকলকেই যথাযোগ্য আসনে উপবেশনে অনুমতি করিলেন, এবং সস্নেহে কুশল প্রশ্নাদির পরে আগমন-হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সমস্ত সুরগণ সুররাজের প্রতি অভি-নিবেশ করিলেন; তাহা অনুভব করিয়া তিনিই সেই বাগ্দেবীর নিকটে উত্তর বাক্য নিবেদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইন্দ্র।—জননি! আপনি কৃপা করিয়া যাহাকে ঐ চরণযুগ-লের দর্শন দান করেন, তাহার সমস্ত প্রয়োজনের শেষ হইয়া যায়, সমস্ত কামনা, সমস্ত বাসনা সমূলে উন্মূলিত হয়। সুধা-সমুদ্র প্রাপ্ত হইলে যেমন কূপোদকের নিমিত্ত কেহ লালায়িত

হয় না, ঐ সর্ব্বাশুভ-নিবারক, সর্ব্বাভাব-পরিপূরক, চরণ যুগলের সন্দর্শন পাইলেও তেমন অন্য কোন বিষয়ে অভিলাষ বা অনুরাগ হইতে পারে না। এজন্য জ্ঞানিগণ এই সন্দর্শনকেই ধ্রুব তারা করিয়া সমাধি যোগাদি উপকরণের অবলম্বনে ভব-সমুদ্রে "পারী" ধরিয়া থাকেন, আমরাও সতত শ্রীচরণ সন্দর্শনই প্রার্থনা করি, এবং, যাহাতে ইহার গৌরবাদরের কোনরূপ ত্রুটি হয়, তাহা দেখিলে বিশেষ বেদনা অনুভব করি। জ্ঞানরূপিণি! সর্ব্বজ্ঞে! আপনার অবিদিত কোন তত্ত্বের অস্তিত্বই নাই, তথাপি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য সমস্ত বলিতেছি। জননি! সংপ্রতি কতিপয় বৎসর হইতে ঐ দ্বিতীয় বিষয়টা আমাদিগকে নিতান্তই প্রব্যথিত করিতেছে। পৃথিবীতে ঐ ভবারাধ্য চরণ-যুগলের অবমাননা হইতেছে। হিমালয়ের চিরাচীর্ণ দুশ্চর তপস্যা-ফলের পরিপূরণের নিমিত্ত যে প্রতিবৎসর তিন দিন কাল আপনি ধরণীমণ্ডলে আবির্ভূতা হয়েন, তখন নব্য নগর নগরীর ভূরি ভূরি দুরাচারগণ দুর্গোৎসবের অভিনয় করিয়া নানাবিধ পাপাচরণ করে। তাহারা আপনার এই যোগি-ধ্যেয় মূর্ত্তির একটা ম্লেচ্ছাকার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত করে, পরিচ্ছদাদিও সেইরূপই দেয়, তৎপরে বারাঙ্গনা সুরাদি লইয়া তিন দিন পর্য্যন্ত পাশব ভাবে মগ্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আপনার পূজাক্রিয়াতে আরো এত গর্হিত আচরণ করে যে, তাহা আমাদের ততোধিক মনঃপীড়াবহ। বিশেষতঃ, এবার দূত প্রেরণার দ্বারা যেরূপ অবস্থা জানা গিয়াছে, তাহা উপস্থিত সর্ব্বদেবগণের নিশ্চয়ই অসহনীয় হইবে। অতএব জননি! এবার হিমালয় গমনের

সংকল্প প্রতিসংহৃত করিয়া চরণোপান্ত পতিত-দেবগণকে সমাশ্বস্ত করিবেন, ইহা অভিলাষ করিতেছি।

জগদম্বা।—বৎস! ভারতের অনেক স্থানেই, আমার পৃথিবী সংস্পর্শ কালে, তোমার বর্ণনানুরূপ ঘটনা হইয়া থাকে, সত্য; তদ্দর্শনে তোমাদের বিরক্তি বা মনোবেদনা হওয়াও সম্ভবপর, এতৎ সমস্তই আমার বিদিত আছে। কিন্তু বাবা! সেই মদ্‌গতপ্রাণা মেনকার সেই হৃদয়স্পর্শী আহ্বান উপেক্ষা করা আমার নিতান্ত কষ্টাবহ হয়, তাই প্রতিবারেই তোমাদিগকে সমাশ্বস্ত করিয়া পৃথিবীতে গমন করিয়া থাকি। তা হউক, এবৎসর তাহাও উপেক্ষা করার সঙ্কল্প করিলাম। এবার তোমাদের নির্ব্বন্ধ প্রতিপালনেই ইচ্ছা রহিল, কিন্তু শ্রীমান্ কালীশরণের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ চিন্তা আছে। সে পূজা করিলে, তাহার আহ্বান উপেক্ষা করা আমার অধিকতর ক্লেশাবহ হইবে।

ইন্দ্র।—জননি! অভয় অনুমতি পাইলে, কালীশরণ যাহাতে আপনার পূজা-চেষ্টায় বিরত থাকেন, তাহা আমরা করিতে পারি, তাহা হইলে আর কোন উদ্বেগই থাকিবে না।

জগদম্বা।—তাহা যদি পার, তবে আমার অসন্তোষের কোন কারণ নাই

অনন্তর দেবগণ তদনুরূপ অনুষ্ঠানের অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে কালীশরণ মহাশয় অদ্য প্রাতঃকৃত্য সমাধান্তে সেই অকূল জলে ভাসমান বংশমঞ্চে উপবিষ্ট অর্দ্ধাঙ্গহরার সহ এইরূপ বার্ত্তালাপ করিতেছেন :—

গৃহিণী।—গুরো! কেবল কচ্চীশাকাহারের দ্বারা অদ্য সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইল, ইহার পূর্ব্বেও বহুদিন হইতেই কখনো দ্বি ত্রি মুষ্টি অন্ন, কখনো যবাগু, কখনো কদলীসার, কখনো কচ্চী-শাক, কোন দিন বা কিছুই না, এইরূপে কালযাপন হইতেছে। অধিদেব! ঈদৃশ দীর্ঘকাল ব্যাপক অন্ন-ব্যসনের দ্বারা আপনার ঐ মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মচর্য্য-স্বরূপ দেহটি আমার নিতান্ত শোকাবহ হইতেছে। ইহার এতাদৃশ অভূতপূর্ব্ব জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা সন্দর্শন করিতে আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় অবসন্ন হয়, উপবাস ক্ষয়াবশেষ জীবনটা যেন একবারেই নিমীলিত হয়। প্রভো! আপনার এরূপ অবস্থা সন্দর্শনে আমি কোনমতেই এ জীবন ধারণে সমর্থা হইতেছি না। অধীশ্বর! মা কি এইরূপেই আমাকে লোকা-ন্তরিতা করিবেন?

কালীশরণ।—পতিপ্রাণে! শান্তা হও, প্রতিবুদ্ধা হও। স্বতঃ-ক্ষয়শীল, অবশ্য বিনশ্বর অমেধ্য-স্বভাব ভূত রচিত দেহপিণ্ডের অভাবাশঙ্কা করিয়া কশ্মলাবিষ্টা হওয়া আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর পক্ষে সমুপযুক্ত নহে। পতিব্রতে! আমি এ জড়পিণ্ডের নিমিত্ত কিছু মাত্র চিন্তিত নহি, ইহা ঘটনামতে যাহা সম্ভব, হউক, কিন্তু একটি বিষয় আমার নিতান্ত মর্ম্মান্ত বেদনাবহ হইয়াছে, ইহা আর সহ্য হইতেছে না। যে মুখে সুধা অর্পণ করিতে ও বাসবাদি দেবগণ ভীতবৎ দণ্ডায়মান থাকেন, হতভাগ্য আমি আজ সপ্তাহ যাবৎ সেই ত্রিভুবন-বিধাত্রী রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা মায়ের শ্রীমুখে কেবলমাত্র অলবণ কচ্চীশাক অর্পণ করিতেছি! মা আর কত দিন আমাকে এ যন্ত্রণায় নিপীড়িত করিবেন, তাহা জানি না। তৎপর, আর একটি চিন্তাও ক্রমে ঘনীভূত হইয়াছে। বাৎস্যা-

য়নি! ঐ দেখ, মায়ের কুটীরখানি জল মধ্যে শয়িত হইয়াছে। মায়ের শুভাগমন দিন নিকটবর্ত্তী হইল, অদ্য আশ্বিন মাসের চতুর্থ দিন। এখন হইতে কুটীরখানির কথঞ্চিৎ সংস্কার চেষ্টা না করিলে, মায়ের প্রতিমা গঠনাদির উদ্যোগ হইতে পারিবে না; অতএব অদ্য তাহারই যত্ন করিব। কিন্তু চিন্তা করিতেছি জলের। প্রাঙ্গণ মধ্যেই বক্ষ মাত্র জল, ইহার একটু দূরে যাইতে হইলেই মৃত্তিকায় পদস্পর্শ হয় না, তখন সন্তরণ করিতে হয়! সন্তরণের দ্বারা সেই অরণ্যে যাওয়া এবং বংশাদি সংগ্রহ করা কিরূপে সম্পন্ন হইবে, তাহাই ভাবিতেছি। যাহা হউক, মায়ের নাম লইয়া যাত্রা করি, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। এই বলিয়া এক খানি দাত্র মস্তকে বন্ধন করিয়া মায়ের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন, এবং অতি যত্নে অতি কষ্টে সেই শীর্ণ দেহটি লইয়া সন্তরণ করিতে করিতে বহুক্ষণে সেই গ্রামের প্রান্তস্থ বংশবনে উত্তীর্ণ হইলেন। সেখানে গিয়া একটি বংশ কর্ত্তনাদি করিয়া আর একটি কাটিতেছেন, এমন সময়ে সেই বংশপর্ব্বের বিল হইতে একটি কৃষ্ণ সর্প সমুত্থিত হইয়া তাঁহার বাম করের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগে দংশন করিল। কালীশরণ, সেই জাতি-সর্পের বিষের শক্তি বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই দাত্রের দ্বারা দষ্ট কনিষ্ঠাঙ্গুলীটি সমূলে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছেদন-ক্ষত হইতে দেহের ক্ষয়াবশেষ রুধির টুকু প্রায়ই নিঃসৃত হইল। কিন্তু কালীশরণ মায়ের চরণ-সুধা মধ্যে মনোনিবেশ করিয়া, কথঞ্চিৎ আত্মস্থ থাকিয়া বেদনা সম্বরণ করিলেন, এবং একটু বিবেচনানন্তর বলিতে লাগিলেন।—

"ভুজঙ্গম! তোমার আমা হইতে কোন ভয় নাই, তুমি

নিরাপদে আশ্রয়ীকৃত নীড়ে পুনর্ব্বার প্রবিষ্ট হইয়া বসতি কর। আমার নিকট তুমি কোনরূপ অপরাধী নহ। আমিই তোমার আশ্রয় নাশের অপরাধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এই প্রলয়প্রতিম বন্যা-বাধায় তুমিও আমার মতই বিপন্ন হইয়া, এই বংশবিলের আশ্রয় লইয়াছিলে। আমি অজ্ঞানতঃ তাহার বাধায় প্রযত্ন করিয়াছিলাম, তাহার সমুচিত দণ্ড হইয়াছে। এখন তুমি নির্ব্বিঘ্নে বাস কর। কিন্তু ভ্রাতঃ! তুমি আপাততঃ আমাকে বড়ই বিপন্ন করিয়াছ। আমাকে এই বংশ লইয়া মায়ের কুটীর সংস্কার করিতে হইবে, তাহা এই সবেদন ছিন্নাঙ্গুলী হস্তের দ্বারা নিষ্পন্ন করা বিশেষ কষ্টাবহ হইবে। হউক, মায়ের ইচ্ছা থাকিলে অবশ্যই আমার কার্য্য বাধিত হইবে না।" এই বলিয়া তাদৃশ হস্তের দ্বারাই অতি ক্লেশে অপর আর একটি বংশ কর্ত্তন করিলেন। এবং দুইটি বংশকে একত্রিত করিয়া জলে ভাসাইয়া, স্বয়ং পূর্ব্ববৎ সন্তরণের দ্বারা কোনমতে স্বকুটীরে প্রত্যুপস্থিত হইলেন। অনন্তর অর্দ্ধাঙ্গিনীকে সঙ্গিনী করিয়া তদ্দ্বারা মায়ের কুটীরখানিকে কোনমতে একরূপ কার্য্যোপযোগী করিলেন। এইরূপে কালীশরণের মণ্ডপ সংস্কার হইল। এখন মায়ের প্রতিমা নির্ম্মাণের উদ্যোগ করিবেন।

কালীশরণের গ্রাম-প্রতিবাসী একজন ধর্ম্মভীরু কুম্ভকার ছিল। সে অতি সামান্য কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক আর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াই, প্রতি বৎসর কালীশরণের প্রতিমা নির্ম্মাণ করে। এবারও সেই ভরসায় নির্ভয়ে কালীশরণ সেইরূপ সন্তরণ করিতে করিতে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া মন্তব্য বিজ্ঞাপ্ত করিলেন। কিন্তু কি যেন, কি কারণে এবার সে তাহার পূর্ণ পারিশ্রমিক

সমস্তই অগ্রে না লইয়া প্রতিমা নির্ম্মাণে স্বীকার করিল না। কালীশরণ বহুবিধ অনুনয় আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি করিলেন, কিছু-তেই সেই কুম্ভকার পূর্ব্বনিয়মে বাধ্য হইল না।

কালীশরণ মহাশয়ের অবস্থা, পাঠক অবগত আছেন। তিনি অর্থ দিতে সমর্থ কি না তাহাও জানিতেছেন, সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তিনি কুম্ভকারকে কোনমতেও বাধ্য করিতে না পারিয়া, বন্যার জলে অশ্রুজলের সম্মূর্চ্ছনা করিতে করিতে পূর্ব্ববৎ সন্তরণে স্বকুটীরে প্রত্যাগত হইলেন।

পর দিবস, নিজেই প্রতিমা গঠন করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন এবং মৃত্তিকাহরণ মানসে এক খানি কুদ্দাল লইয়া কদলী-ভেলার সাহায্যে নদীতীরে উপনীত হইলেন। অনন্তর সেখানে পাদমাত্র জলে মৃত্তিকা খনন করিতেছেন, ইত্যবসরে সেই পদ্মানদী হইতে অতি ঘোরতর কুম্ভীর উত্থিত হইয়া তাঁহার দক্ষিণ পাদ গ্রাস করিয়া নদী মধ্যে লইয়া চলিল। তখন কালীশরণ জীবনের শেষ সময় বুঝিতে পারিয়া তাদৃশ জঘন্য মৃত্যুতে ভীত হইলেন, এবং জগন্মাতার ধ্যানের অবকাশের আশায় আকস্মিক মৃত্যু হইতে শরীর রক্ষা করা আবশ্যক বোধ করিলেন। সে জন্য হস্তস্থিত কুদ্দালের দ্বারা গ্রাহগৃহীত পদখানি কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন, গ্রাহও, ছিন্ন পদখানি লইয়া জলমগ্ন হইল। অনন্তর কালীশরণ সুদারুণ বেদনানলে দহ্যমান হইয়া কিঞ্চিৎকাল নিঃসংজ্ঞ ভাবে রহিলেন। তৎপর কিঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ হইলে, সংসার-রোগের মহৌষধ ত্রিতাপহরণ মায়ের পা-দুখানির রস-পানে মনোনিবেশ করিলেন। যামদ্বয় পর্য্যন্ত তাহাতেই নিমগ্ন থাকিলেন। অনন্তর পুনর্ব্বার বহিঃসংজ্ঞা হইল। তখন

মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। "আমার ব্যসনকারী কুম্ভীরের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া বিহিত নহে! সে তাহার নির্দ্দিষ্ট আহারেই অভিলাষ করিয়াছিল, তবে যে অন্য কিছু না লইয়া আমিই তাহার ব্যাপদনীয় হইলাম, ইহা আমার জন্মান্তরীণ কুকৃতের ফল। কিন্তু সে কুকৃতও স্বাধীন কোন বস্তু নহে, তাহা আমার দ্বারাই সঞ্চিত হইয়াছিল। আমার ক্রিয়াতেও যদিচ মায়ের ইচ্ছাই মূল কারণ বটে, তথাপি সে ইচ্ছা যখন জীবগণের জ্ঞান বুদ্ধির অধিকারাতীত, তখন তাহা লইয়া দয়াময়ী মাকে কোন দোষারোপ করিতে পারা যায় না; সুতরাং এ প্রাণ-ব্যসন ঘটনা আমা হইতেই উপনীত হইয়াছে; অতএব আমি স্বয়ংই ইহার একমাত্র কারণ। তা হউক, কিন্তু আমি পাদকর্ত্তনের দ্বারা সেই গ্রাহগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া লাভ করিলাম কি? এখন যে দেখিতেছি, আমার সেই আকস্মিক মৃত্যুই আপেক্ষিক শ্রেয়স্কর ছিল। এখন, এ দেহ যদি থাকে, তাহা হইলেও এইরূপ শক্তিরহিত পঙ্গু দেহের দ্বারা কি করিব? ইহার দ্বারা ব্রহ্মণ্যদেব রক্ষা করা নিতান্তই অসাধ্যবৎ হইবে। তৎপর, যাহার নিমিত্ত এত কষ্ট করিলাম, অগাধ জলে ভাসিতে ভাসিতে ডুবিতে ডুবিতে কতকিছু করিলাম, সেই দারুণ সর্পাঘাত সহ্য করিলাম, কত প্রাণান্ত করিয়া সেই বংশাদি আহরণ করিলাম, কুটীর সংস্কার করিলাম, তৎপর কুম্ভকার কর্তৃক কত ন্যক্কৃত হইলাম, তাহাও তো সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল। এই দারুণ যন্ত্রণাবহ রুধিরস্রাবী খঞ্জপদ আমাকে মোমুহ্যমান করিতেছে! চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছি, অন্তর শূন্যময় হইতেছে, শীর্ণ দেহটা অবসন্ন

হইতেছে, এখন ইহার দ্বারা আমি কি করিব! কেমন করিয়া মৃত্তিকা নয়ন করিব, কেমন করিয়া কুটীরে যাইব, কিরূপেই বা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিব, তৎপর দুখানা কচ্চীশাকের ভোগই বা কি প্রকারে আসাদিত হইবে! মাগো জগজ্জননি! তোর ইচ্ছা-সমুদ্রের মধ্যে কি হতভাগ্য কালীশরণের এইরূপ পরিণাম লুক্কায়িত ছিল"? ইত্যাদি নানাবিধ দুঃখ সংলাপ করিয়া কালীশরণ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য বিমূঢ় ভাবে রহিলেন। অনন্তর এইরূপ কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। "হউক, আর বিলাপ করিয়া কি হইবে! এখন বোধ হয় জীবনের অধিক সময় অবশিষ্ট নাই, যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় দুই তিন মুহূর্ত্তের মধ্যেই দেহ-পিণ্ডের ক্রিয়ার শেষ হইবে! অতএব ইহার যে অবশিষ্ট শক্তিটুকু আছে, তাহা মায়ের ক্রিয়াতেই শেষ করা কর্ত্তব্য। তৎপর যখন দেখিব যে ইহা পরিসমাপ্ত হইল, তখন এই নদীতীরে জলমধ্যে শয়িত হইয়া মায়ের চরণযুগল স্মরণ করিতে করিতে দেহ বিসর্জ্জন করিব।" এই বলিয়া কালীশরণ মহাশয়, সেই পরিহিত ছিন্নবস্ত্র খানির কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষত স্থানের উপরিভাগটা বন্ধন করিলেন। তাহাতে রুধিরস্রাব কিছু বাধিত হইল। অনন্তর জানু অবলম্বনে অৰ্দ্ধদণ্ডায়মান হইয়া সেই কুদ্দালখানি গ্রহণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে মৃত্তিকা খননে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে কার্য্যোপযোগী মৃত্তিকা সংগৃহীত হইল। তখন অতিক্লেশে ম্রিয়মাণভাবে সেই মৃত্তিকা পিণ্ড কটি সেই ভেলাতে উত্তোলন করিয়া কুটীরাভিমুখে ভেলাটি বাহিতে লাগিলেন, ক্রমে কুটীরে প্রত্যুপস্থিত হইলেন। অনন্তর পতি-পর্য্যুৎসুকা অর্দ্ধাঙ্গিনীকে সমস্ত আবেদন করিয়া বিবিধ সান্ত্বনা-

নন্তর সেই মৃত্তিকার দ্বারা নিজেই কোনরূপে মায়ের ক্ষুদ্রাকার একখানি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলেন। চূর্ণ এবং হরিদ্রাদির দ্বারা তাহা রঞ্জিতও করিলেন। ক্রমে পূজা দিন নিকটবর্ত্তী হইল, আজ মায়ের অধিবাসের দিন, কিন্তু কালীশরণের হস্তক্ষত, পদক্ষত আজও শুষ্ক হয় নাই, যন্ত্রণাও কিঞ্চিৎ অল্পতর মাত্র। তাই এতদিন অন্য কোন উদ্যোগই করিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ আর নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নাই বলিয়া, সেইরূপে সেই ভেলার সহায়তায় ভিক্ষান্বেষণে ভাসমান হইলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গ্রামের অবস্থা অতীব শোচনীয়, প্রায় অনেকেই অর্দ্ধাহারে একাহারে দিনপাত করিতেছেন, সুতরাং কালীশরণ তাঁহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া সমস্ত দিনান্তে এক ক্রুঞ্চিমাত্র তণ্ডুল সংগ্রহ করিলেন, আর কিছু কচ্চীশাক, আর কদলীসার সমাহরণ করিয়া সায়ংকালে কুটীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে গৃহিণীও সন্তরণের দ্বারা কয়েকটি জলজ পুষ্প আর বিল্ব পত্রের সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।

ক্রমে অধিবাসের সময় সমুপস্থিত হইল। অনন্যশরণ কালী-শরণ স্বয়ং বিল্বমূলে মায়ের আধিবাসিক পূজা করিয়া প্রতিমার অধিবাস কার্য্য করিলেন। কিন্তু কেমন কেমন যেন হইল! অন্য বৎসরের মত মায়ের অবির্ভাবের কোন সূচনা পাইলেন না। পূজাস্থান যেন শূন্য শূন্য বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং কালীশরণ অতি খিন্নভাবে দীন মনে সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া, সেই সুদারুণ দুঃখসূচক বিষয় অর্দ্ধাঙ্গিনীকে বলিলেন। "সাধ্বি! হতভাগ্যের সমস্ত আশাবন্ধনই, বোধ হয়, সিকতার সেতুবন্ধন হইল। যাহা কিছু করিলাম, যাহা কিছু ভাবিলাম, সমস্তই বুঝি

স্বাপ্ন ক্রিয়ায় পরিণত হইল। অদ্য অধিবাসন-ক্রিয়াতে আমি অতি নিপুণ হইয়া, অতি ব্যগ্র হইয়া মাকে ডাকিলাম, কিন্তু তাঁহার আগমন তো হইলই না, তৎসূচক কোন লক্ষণও অনুভব করিলাম না। সত্যই তো, প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে, তাহা হইবেই বা কেন? হরি-বিরিঞ্চি-সহস্রার-বিলাসিনী, পীযূষ-পায়িনী মা, হত-ভাগার এই জঘন্য কুটীরে কচ্চীশাক ভোজনের জন্য আগমন করিবেন কেন? আমি নিতান্ত দুর্ম্মেধা, নিতান্ত পুরোভাগী, তাই ঈদৃশ অসদৃশ আশায় নিবদ্ধ হইয়া উন্মত্তের মত কত কিছু করিতেছি, কত কিছু ভাবিতেছি! ইহা কি কখনও সম্ভবে? আকাশের শশধর কি বামনের করস্থ হইতে পারে? মানসসরো-বরের হংসী কখনও মণ্ডূক-কূপে বিহার করিতে পারে কি? কদাচ নহে। সুতরাং আমাদের আশা ভরসা সমস্তই বৃথা। হউক, তথাপি কল্যকার দিনটা প্রতীক্ষা না করিয়া, শেষ কর্ত্তব্য অনু-ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব না। সমস্ত হেতু যুক্তি বুঝিতে পারিলেও আত্মার আবেগ আমায় নিরাশস্ত হইতে দিতেছে না, এজন্য আগামী পূর্ব্বাহ্ণ পর্য্যন্ত একবার দেখিব।" এই বলিয়া পতি পত্নী উভয়েই অনাহার অবস্থায় মায়ের গুণ মহিমা শক্তি ঐশ্বর্য্যাদি এবং নিজের অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে রজনী অবসান করিলেন।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

পরদিবস প্রত্যূষে বহির্গত হইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধান্তে মায়ের কুটীর মার্জ্জনাদি করিলেন। অনন্তর অতি কষ্টে জানু

দ্বারা বিসর্পিত হইয়া কয়েকটি পুষ্প ও বিল্বপত্র আহরণ করিলেন, আর সেই ভিক্ষালব্ধ ক্রুঙ্কি (কুন্‌কে বা টুরী) মাত্র তণ্ডুলের কিয়দংশের নৈবেদ্য ও কিয়দংশের অন্ন এবং সেই অলবণ কচ্চী শাক—এই কয়েক উপহার সংগ্রহ করিয়া পূজাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর যথাবিধি আচমনাদি ক্রিয়ান্তে, সাশ্রুলোচনে, গদ্গদকণ্ঠে, উদাত্তস্বরে দেবীসূক্ত পাঠ করিয়া মায়ের আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু মায়ের আগমনের কোন লক্ষণ বুঝিতে পাইলেন না, তখন পুনর্ব্বার সেইরূপ সমাহ্বান করিলেন, সেই ক্ষীণ দেহের কণ্ঠশক্তি নিঃশেষ প্রায় হইল, কিন্তু মায়ের কোনই তত্ত্ববার্ত্তা প্রাপ্ত হইলেন না। এবার নিশ্চয় বুঝিলেন, সেই ত্রিভুবনবিধাত্রী রাজরাজেশ্বরী মা তাহার কুটীরে আগমন করিলেন না, এবং গতরাত্রির চিন্তিত বিষয়ই তাহার একমাত্র হেতু বলিয়া অনুমান করিলেন। তখন কালীশরণের হৃদয়ে অকূল নৈরাশ্য-সমুদ্র প্রাদুর্ভূত হইয়া, প্রচণ্ড তরঙ্গ-বেগের দ্বারায় তাঁহার সেই উন্মূল-প্রায় জীবন-তরুকে উন্মথিত করিল। জীবন-তরু পতনপ্রায় হইল। তাহার পরে আবার মায়ের আগমন আশায় অনুষ্ঠিত ব্যাপারে কালীশরণের যে সকল ঘটনা অতীত হইয়াছে, সমস্তই যুগপৎ বর্ত্তমানবৎ অনুভূত হইতে লাগিল। সেই বিষধরের বিষজ্বালা, তৎপরে সেই অঙ্গুলাচ্ছেদের যন্ত্রণা, সেই নিরাহারে সন্তরণ ক্লেশ, কুম্ভকারের হুঙ্কার, কুম্ভীরের ঘোর দংষ্ট্রায় নিষ্পেষণ, আর কুদ্দালে জানু-কর্ত্তন, সেই অবস্থায় মৃদাহরণ, ভিক্ষাহরণ ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই যেন যুগপৎ তৎকালবর্ত্তী বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। তখন সেই কালীশরণের আলুলায়িত সুরুক্ষ কেশজালে সমাচ্ছন্ন

সুদীর্ঘ ললাটফলক ঘর্ম্মার্দ্র হইল। নয়নদ্বয় অশ্রুজলে মগ্ন হইয়া পড়িল। শ্মশ্রু সমাকুল গণ্ডস্থলে ধারা বহিতে লাগিল। তখন জানুনির্ভরে দণ্ডায়মান হইয়া, কালীশরণ মহাশয় কৃতাঞ্জলিপুটে মাকে বলিতে লাগিলেন :—

কালীশরণ। মাগো জগদম্বে! আমি সমস্তই অবগত হইয়াছি। সপ্তস্বর্গের চূড়ামণি কৈলাস ধাম পরিত্যাগ করিয়া, হরি-হর-বিরিঞ্চিমূর্দ্ধস্থিত সহস্রদল কমলের কর্ণিকাসন উপেক্ষিত করিয়া, এ হতভাগার জঘন্য কুটীরে তোর শ্রীপদের সমাগম কখনই সম্ভবপর নহে, তাহা সত্য। তোর সেই স্বপ্রকাশ-রূপিণী মূর্ত্তি আমার নির্ম্মিত এই ঘৃণার্হ মৃৎপিণ্ড স্পর্শ করিতে পারে না, ইহাও সত্য। তৎপরে যে রাঙ্গা চরণ-দুখানির শোভা হানি হইবে বলিয়া পারিজাত পুষ্পাঞ্জলি লইয়াও দেবরাজ ভীতবৎ ইতস্ততঃ করেন, তাহা আমার এই কলঙ্কীপুষ্পে কলুষিত হইবে, ইহা কদাচ সঙ্গত নহে। আর সতত সুধাপানে যে মুখে বিরক্তির আভাস প্রতিভাসিত হয়, তাহা এই দুর্ভাগা দুর্মেধার উপকরণ-বিহীন একমুষ্টি তণ্ডুল আর অলবণ কচ্চীশাকসম্বলিত দ্বিমুষ্টি অন্ন গ্রহণ করিবে, ইহা সর্ব্বাধিক অসম্ভাব্য বিষয়—ইত্যাদি কিছুই আমার অবিদিত নাই। কিন্তু মা! আমি বুঝিলে কি হইবে, আমার প্রাণ তো তাহাতে প্রবুদ্ধ হইল না! সে তো সম্ভব-অসম্ভব শুনিতে চায় না, সঙ্গত অসঙ্গত মানিতে চায় না। কারণ কি, জানি না; সে সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি বিসর্জ্জন করিয়া এই কুটীরেই তোকে আনিতে সাহস করিতেছে, এই কদর্য্য উপহার প্রদানে উৎসাহী হইতেছে এবং সেই জন্যই এত ক্লেশ, এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। এখন তুই

না আসিলে, হতভাগার পঞ্চপ্রাণ কোনমতেই এ ভগ্ন দেহ ধারণ করিবে না। তাই বলি, মা! একটু কৃপাকটাক্ষ কর, মাত্র তিন দিবসের জন্য দুর্ভাগা কালীশরণের কুটীরে একবার পদার্পণ কর। মাগো! এ সংসারে আমার আর কিছুই নাই। কেবল তোর ঐ রাঙ্গা চরণ দুখানি, উহাকেই আলম্বন করিয়া এই ভগ্ন দেহদণ্ড এযাবৎ সংস্থিত রহিয়াছে। মাগো! উন্মূলিত কুমুদ যেমন মৃত হইয়াও পূর্ব্ব সংস্কারবলে সুধাকরের সুধা-প্রতীক্ষায় প্রস্ফুটিত থাকে, আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ উন্মূলিত এবং জীবন-বিহীন হইয়াও সেইরূপ তোর চরণ-সুধার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কথঞ্চিৎ প্রকাশমান আছে। এখন তাহা না পাইলে, মুহূর্ত্ত-মধ্যেই সমস্ত অন্তর্হিত হইবে। মাগো! তোর কিছুই অবিদিত নাই, আমার যাহা কিছু ঘটিয়া গিয়াছে, সমস্তই অবগতা আছিস্। সেই সকল প্রাণাত্যয়কারক ঘটনা সত্ত্বেও কেবলমাত্র তোর চরণ দর্শনের প্রতীক্ষায় নির্ভর করিয়া আমি অবস্থিত রহিয়াছিলাম। নতুবা কি ছয় মাসের আহার ব্যসনে, এই নলিনীদলবজ্জীবন প্রতিষ্ঠমান হয়? কিম্বা সেই কৃষ্ণসর্পের বিষজ্বালা, অঙ্গুলীচ্ছেদনের যাতনা, কুম্ভীরের করাল দংষ্ট্রাপেষণ এবং পদচ্ছেদনের সুদুর্ব্বহ বেদনা উপভোগ করিয়া অদ্যাপি বিদ্যমান থাকে? তাহা কদাচ নহে। মা! তোকে দেখিব বলিয়া তদৌৎসুক্যে নিমগ্ন হইয়াই, আমি তাদৃশ মৃত্যুজনক ঘটনাতেও মনোনিবেশ করিতে অবকাশ পাই নাই, তাই সমস্তই সহ্য হইয়াছে; তাহা লইয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানেও বিরত হই নাই। কিন্তু মা! এখন তোর আমার নিরাশায় যে আমার সেই সমস্তই বর্ত্তমানবৎ প্রত্যুপস্থিত হইল। তৃণাচ্ছা-

দিত হুতাশনের ন্যায় সমস্তই পরিদীপ্ত হইল। মাগো! আর যে সহ্য করিতে পারিতেছি না! আমার চিরসম্ভৃত আশাবন্ধ ছিন্ন হইয়া পড়িল, ছিন্ন শিক্ককুম্ভশ্রেণীর ন্যায় আমার পঞ্চ-প্রাণের সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ নিপতিত হইল। মাগো! জগ-দম্বে! হতভাগার জীবন যে আর জীবিত থাকে না। এখন সেই সুদারুণ গরল-জ্বালায় অবসন্ন হইলাম! অঙ্গুলীচ্ছেদের যন্ত্রণায় দন্দহ্যমান হইলাম! কুম্ভীরের দংষ্ট্রা-পেষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইলাম! পদচ্ছেদনের সুদুঃসহ যাতনা আমাকে মূর্চ্ছিত করিল! আর তো সহিতেছে না, নিরালম্ব জীবন তো আর রহি-তেছে না! মাগো! তুই কোথায়? হতভাগ্য কালীশরণের দুটা কথা শোন! মা! আমার কোন উপহার বা কোন কিছুই তোর উপযুক্ত নহে, তাহা সহস্রবার সত্য। কিন্তু মা! এ দীন দরিদ্রের যে আর কিছুই নাই! এ তনয়াধম প্রাণান্ত করিয়াও কিছুই প্রাপ্ত হইল না! কলম্বী পুষ্প আর কচ্চী শাক ব্যতীত আর কিছুই ঘটাইতে পারিল না! মাগো! তুই তো আমার মা-ই বটে, আমার কিছুই নাই বলিয়া কি প্রাণান্ত সময়েও একবার দেখা দিবি না? মা! তোকে কোন উপহার গ্রহণ করিতে হইবে না। ইহা দেখিতেও অনুরোধ করি না। প্রতিমায় প্রবেশেরও প্রয়োজন নাই, স্পর্শেরও আবশ্যক নাই, তুই একবার মাত্র আসিয়া তোর সেই রাঙ্গাচরণ দুখানির দর্শন দান কর। মাগো! আমি আর কিছুই চাই না, একবার সেই সুধা-মাখা পা-দুখানির দর্শন দান কর। মা! আমি সমস্তই সহ্য করিয়াছিলাম, প্রাণাধিক তনয় তনয়াদিগকে প্রজ্বলিত হুতাশনে সমর্পণ করিয়াও জীবিত

ছিলাম, কেবল তোরই পা-দুখানি প্রাণের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া অনুপ্রাণিত ছিলাম, আজ তাহারও অভাব হইলে কেমন করিয়া বাঁচিব, কেমন করিয়া থাকিব? মাগো! ওমা! জগদম্বে! দোহাই তোর পা-দুখানির, দোহাই তোর "দুর্গতি-হরা" নামের। ক্ষণ কালের নিমিত্ত একবার দর্শন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর। মাগো! আর সহ্য হয় না, একবার দর্শন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর।" এইরূপ বলিতে বলিতে সস্ত্রীক কালীশরণ অচেতনবৎ হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইলেন।

এদিকে আনন্দময়ীর কৈলাসধাম যেন হঠাৎ নিরানন্দবৎ হইল, যেন কি একরূপ সংক্ষুব্ধবৎ হইল! মায়ের শ্রীমুখমণ্ডল ম্লানায়মান হইল, অধৈর্য্যের আভাস প্রকাশ করিতে লাগিল! স্তন-ঘট হইতে দুগ্ধ-ধারা স্যন্দিত হইতে লাগিল। সভাস্থ দেববৃন্দ সচকিতে টলটলায়মান হইলেন। মায়ের প্রসন্নতা প্রত্যাশায় উচ্চৈঃস্বরে "দেবীমাহাত্ম্য" গান করিতে লাগিলেন, এবং "রক্ষ রক্ষ" বলিয়া সজয় ধ্বনি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

অপর দিকে সভার্য্য কালীশরণ মুহূর্ত্ত পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া নয়ন উন্মালিত করিলেন, দেখিলেন সমস্ত কুটীর সেইরূপ শূন্যময়ই আছে, সেইরূপ অন্ধকারই আছে, মায়ের শুভাগমন হয় নাই। তখন অর্দ্ধাঙ্গিনাকে এইরূপ বলিলেন।—

কালীশরণ।—সতী-কুল-চন্দ্রিকে! পতিপ্রাণে! হতভাগ্যের কুটীরে মা নিশ্চয়ই পদার্পণ করিবেন না, তাহা অবধারিত হইল। সুতরাং এ জীবন রক্ষা পাইবার আর উপায়ান্তর নাই, প্রয়োজন ও নাই। দুই মুহূর্ত্ত পরেই, বোধ হয়, ইহা এই ভগ্ন দেহটা পরিত্যাগ করিবে। এই দেখ, আমার সেই বিষাদির

যন্ত্রণা যেন সহস্র গুণে পরিস্ফীত হইয়া, এই নিরালম্ব জীবনটাকে নিষ্পেষণ করিতেছে! এখন কোন মতেই ধৈর্য্য রাখিতে পারিতেছি না! মা শূন্য জীবন আর বহিতেছে না ইহা এখনই নিমীলিত হইবে। তাহা হইলে, পতি প্রাণা তুমিও নিশ্চয় আমার পথের অনুসারিণী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য, আমি বিবেচনা করি, এ জীবন এইরূপে অদৃশ্য হওয়া সমুপযুক্ত নহে। ইহা মায়ের নিমিত্তই এত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এত দিন অবস্থিত ছিল, সুতরাং ইহাতে আমাদের কোনই স্বত্ব-স্বামিত্ব সম্পর্ক নাই। ইহা সেই মায়েতেই অর্পিত হইয়াছিল, মায়েরই স্বত্ববৎ বস্তু। অতএব ইহাকে, এখন সেই মায়েরই উপহারে বিনিযুক্ত করিয়া নিঃশেষিত করি। প্রাণ-প্রতিমে! এস, দুই জনেই একত্র হইয়া, ঐ প্রতিমার চরণের উপরি মস্তক দুইটা রাখিয়া যুগপৎ এই ছুরিকার দ্বারা গলদেশ ভিন্ন করিয়া দিই। তাহা হইলেই, জীবন সহ মস্তক দুটি মায়ের চরণের উপহার হইল, মায়ের পূজার সমাপন হইল। প্রিয়ে! দেখ, যেন দুর্গা-নাম বিস্মৃতা হইও না। অজস্র ধারাবাহী দুর্গানাম করিতে থাক। "দুর্গে! দুর্গতিহরে!" এইরূপে ডাকিতে থাক, আমিও ডাকিব। সেই ছিন্ন মুণ্ডের নয়নদ্বয় নিমীলন কালে, মুখকুহর হইতে যখন শেষ বায়ু নিঃসৃত হইবে, তখন যেন "দুর্গে! দুর্গতিহরে!" এই মহাবাক্যের সহিত বিনির্গত হয়। এখন আর কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, জীবন শেষ হইল। এস, এখন সত্বরই সঙ্কল্পিত কার্য্যের সমাধা করি।—এই বলিয়া ছুরিকা গ্রহণ করিলেন। তখন পৃথিবীতে নানাবিধ অমঙ্গল সূচনা হইতে লাগিল। ঘন ঘন ভূকম্পে, হর্ম্ম্য প্রাসাদ এবং গিরিশৃঙ্গাদি ভগ্ন হইয়া

ভূমিসাৎ হইতে লাগিল, সূর্য্যদেবের কিরণাবলী অন্তর্হিত হইল, জগৎ অন্ধকারময় হইল, হুতাশন নিস্তেজ হইলেন, দিগ্‌দাহ উল্কা-পাতে দশ দিক্ দন্দহ্যমান হইল, দিক্‌স্বনে দিঙ্মোহ করিল, ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রবহমান হইয়া খণ্ড প্রলয়ের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইল! শিবা-গণ উচ্চরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল।—ইত্যাদি নানাবিধ উৎ-পাত প্রাদুর্ভূত হইয়া, ধরণী-মণ্ডল সংক্ষুব্ধ করিল, প্রাণিগণের হাহারব উত্থিত হইয়া, কৈলাস পর্য্যন্ত গেল কিনা জানি না, কিন্তু সমস্ত গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল। এদিকে সস্ত্রীক কালীশরণ দুখানি ছুরিকা করে লইয়া প্রতিমার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গলদশ্রুনয়নে গদ্গদকণ্ঠে মাকে দুইটি কথা বলিতে লাগিলেন।—

"মাগো জগদম্বে! জগত্তারিণি! আমি আর কিছুই চাই না। এই জঘন্যতম কুটীরে তোকে আসিতে হইবে না, তোকে সুধা-মুখে এ কচ্চী শাকও দিতে হইবে না, ঐ কৈলাস ধামে থাকিয়াই কেবল একটু দৃষ্টি মাত্র করিবি। বহু কাল যাবৎ আমাদের মন-প্রদত্ত উপহার দুটি আজ বহিঃ প্রদান কালে, একবার স্বীকার করিবি মাত্র। মাগো! এই জীবন প্রায় অনেক দিন হইতেই তোর পদ-কমলে মনে মনে সমর্পণ করিয়াছিলাম, এখন তাহা বহিঃক্রিয়ায় পরিণত করিয়া সঙ্কল্প পরিসমাপ্ত করিব। আমাদের দম্পতির জীবন আর মন প্রাণের অধিষ্ঠান-যন্ত্র মস্তক দুটি তোর এই শ্রীমূর্ত্তির পদে সমর্পণ করিব। তুই ওখান হইতেই কেবল অঙ্গীকার করিবি মাত্র। তা, এই ব্রহ্ম-রক্ত, স্ত্রীরক্ত বলিয়া তোর উপেক্ষা করিবার কোন কারণ নাই। আমি এখন আর ব্রাহ্মণ নহি, স্ত্রীও প্রকৃত স্ত্রী নহে। তোর চরণধ্যানের অভাবে আমার

চণ্ডালত্ব পরিণাম হইয়াছে। স্ত্রীও আমারই অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া অর্দ্ধ পুরুষে পরিণতা হইয়াছে. সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে।" এই বলিয়া দুই জনেই সেই প্রতিমার চরণোপরি মস্তক দুটি রাখিয়া "দুর্গে! দুর্গতিহরে—মাগো! ওমা!" এইরূপ বলিতে বলিতে গলদেশে ছুরিকাঘাত করিলেন। এদিকে, অমনি হঠাৎ যেন কৈলাসপুরী ন্যক্বিন্ন হইয়া পড়িল, ব্রহ্মাদি সুরবৃন্দ বিমূর্চ্ছিত হইলেন, কৈলাসের প্রদীপ অন্তর্হিত হইল। কৈলাসেশ্বরী কৈলাস-নাথের বক্ষ উপেক্ষা করিয়া "হা বৎস, হা বৎসে!" বলিতে বলিতে সেইখানে আবির্ভূতা হইলেন, এবং সেই সুধাময় কর-পল্লব সংস্পর্শনের দ্বারা উভয়ের কণ্ঠক্ষত বিদূরিত করিলেন। কালীশরণের ছিন্নাঙ্গুলী ও ছিন্নপদ পূর্ব্ববৎ সুপ্রতিষ্ঠ করিলেন, শিরোঘ্রাণ আর স্তন্যধারা সেচনের দ্বারা উভয়কেই সমুজ্জীবিত করিলেন। আর বলিলেন, "বৎস! বৎসে!" গাত্রোত্থান কর, এই আমি আসিয়াছি, কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া, কৈলাসপতির হৃদয় ধাম বিসর্জ্জন করিয়া, তোমাদের কুটীরে আগমন করিয়াছি। তোমাদের সর্ব্বাভাব বিদূরিত হইয়াছে। শরীর সুপুষ্ট হইয়াছে, শক্তিমান্ হইয়াছে, দেববৎ লাবণ্য-সম্পদে ভূষিত হইয়াছে। বৎস! কালীশরণ! তোমার কর পদ অক্ষত হইয়াছে, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। বাবা! উঠ, গাত্রোত্থান কর, তোমার আয়োজিত উপহার আমাকে প্রদান কর, আমি এই প্রতিমাতেই অধিষ্ঠিতা হইয়া, তোমার এই কলম্বী কুসুম আর অলবণ কচ্চী শাক গ্রহণ করিব। তৎপরে, ঐ দেখ, কুবের ও ইন্দ্রাদি তোমার মনের অভিলাষ পরিপূরণের নিমিত্ত আমার স্বর্গীয় উপহারাবলী আন-

য়ন করিতেছেন, ইহার দ্বারা আমার পূজা করিয়া নিজ তৃপ্তি সংসাধিত করিবে। তৎপরে অতি সত্বরই আমি তোমাদিগকে এই নরকাকার পৃথিবী হইতে, জড়দেহ বিমোচিত করিয়া, আমার অক্ষয্য ধামের অধিবাসী করিব। বাবা! তোমরা এইরূপ কষ্ট, এইরূপ আত্মসমর্পণ করিয়াছ বলিয়াই, এই যোগি-দুর্লভ স্থান সংপ্রাপ্ত হইলে; এবং সেই মহার্ঘ ফল দিব বলিয়াই, তোমার অত কষ্ট আমি সহ্য করিয়াছি। বাবা! সে কষ্ট কেবল তোমারই হয় নাই, তোমার শরীরে যাহা কিছু হইয়াছে, এই দেখ, আমার তনুও সেই সমস্তে অদ্যাপি চিহ্নিত আছে। আমার ভক্ত তনয় আমার প্রাণাধিক বস্তু, সুতরাং তাহার সুখ দুঃখ সমস্তই আমার দেহে, আমার আত্মায় প্রতিবিম্বিত হয়। বাবা! উঠ, মা! উঠ, তোমাদের সমস্ত দুঃখ তিরোহিত হইয়াছে।

অনন্তর সভার্য্য কালীশরণ পুনর্জ্জীবন লাভে নয়নোন্মীলন করিলেন, এবং সেই, প্রাণের ধ্রুবতারা-মাকে সম্মুখে দেখিয়া হর্ষ-জড়িত নয়নে, প্রাণ ভরিয়া সেই রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন। অতি দারুণ পিপাসা, দারুণ কষ্টের পর, আজ কালীশরণ সুধাসাগর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাই সর্ব্বপ্রাণে সর্ব্বহৃদয়ে পান করিতে করিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অলস হইয়া পড়িল, তখন কিয়ৎকাল বিহ্বল হইয়া থাকিলেন! অনন্তর প্রকৃতিস্থ হইয়া সেই জটাকলাপ মণ্ডিত মস্তকটির দ্বারা মায়ের চরণ-কমল দুটির পরাগ গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে মায়ের দয়ামাখা মুখ-খানির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কেবল অশ্রু জলের তরঙ্গ, আর পরিস্ফীত শ্বাসোচ্ছাসের দ্বারাই, হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ-তরঙ্গ মায়ের নিকট উপস্থিত করিলেন। অনন্তর মায়ের দ্বায়া সুমাশ্বস্ত হইয়া,

আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক নিজের আয়োজিত উপহারের দ্বারাই পূজারম্ভ করিলেন। এদিকে মায়ের আদেশমত সমস্ত দেবগণও স্বর্গীয় উপহারাবলী লইয়া কালীশরণের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। তখন সভার্য্য কালীশরণ মহাশয় আনন্দ সাগরে ভাসিতে ভাসিতে সেই সকল স্বর্গীয় উপহারের দ্বারা মনের সাধ মিটাইয়া তিনদিন পর্য্যন্ত মায়ের উৎসব করিলেন। কালীশরণ কৃতার্থ হইলেন এবার এইরূপে এইভাবে আনন্দময়ীর শুভাগমন হইল। অতঃপর পূর্ব্বাতীত ১৮১০ শকের একটি আখ্যায়িকা বলা যাইতেছে।

পঞ্চম তরঙ্গ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

মেনকার দুর্গোৎসব।

আজ এক বৎসর যাবৎ প্রাণপ্রতিমা উমাকে পাঠাইয়া, গিরিরাণী, পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় দিন গণনা করিয়া আসিতেছেন। এখন ক্রমে সেই সময় ঘনিষ্ঠ হইতেছে, দিনগুলিও যেন ক্রমে দীর্ঘতর হইতেছে। প্রথমে এক এক দিন, এক এক সপ্তাহের ন্যায় অনুভূত হইত, পরে এক এক পক্ষের ন্যায়, তৎপর এক এক মাসের ন্যায়, ক্রমে এক এক বৎসরের ন্যায় অতিবাহিত হইত। কিন্তু এখন ভাদ্র মাস শেষ হইয়া আসিল, এখন আর দিনের দীর্ঘতার পরিমাণ হইতেছে না, আর গণনা চলিতেছেনা, প্রাণে

ধরিতেছে না। এখন এক এক দিন, এক এক যুগযুগান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ যাতনাময় দিনের আর শেষ হয় না। দিননাথ আর অস্তাচলে গমন করেন না। এখন দিবারাত্রি সর্ব্ব সময়ই মধ্যাহ্নে পরিণত হইয়া গিরি-রাণীর মর্ম্মস্থান দগ্ধ করিতেছে! স্পৃহনীয় শরৎকাল এখন তীব্রতর নিদাঘরূপে উপস্থিত হইয়া অবসন্ন করিতেছে। আশ্বিন মাস জ্যৈষ্ঠমাসের দারুণ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া মনপ্রাণ অধীর করিয়াছে। এখন আর উমা আসিবে বলিয়া অদ্য কল্য কল্পনাও নাই, আসা প্রতীক্ষাও নাই, এখন আর সহ্য হয় না, ধৈর্য্য রয় না। এখন মেনকা উন্মত্তা হইয়াছেন! মেনা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মুক্তকেশে, মুক্তবেশে দিবানিশি কেবল উমা উমা চিন্তা করিতেছেন। এখন শয়নে শান্তি নাই, বসনে শান্তি নাই, উত্থানেও শান্তি নাই। জীবন নিদারুণ যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিয়াছে! রাণী একবার বসিতেছেন, একবার শয়ন করিতেছেন, একবার দাঁড়াইতেছেন, একবার মূর্চ্ছিতা হইতেছেন; এবং কখন হাসিতেছেন, কখন কাঁদিতেছেন, কখন বা উমার গুণগান করিতেছেন। শয়ন করিলে দেখিতেছেন, যেন মস্তকের নিকট উমা আসিয়া "মা! মা!" বলিয়া ডাকিতেছে, অমনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া বসিতেছেন, আবার বসিয়া যেন শুনিতেছেন, উমা প্রাঙ্গণ হইতে ডাকিতেছে, অমনি সেইখানে দ্রুতবেগে গমন করিতেছেন, আবার যেন বহির্দ্বার হইতে প্রাণের উমা "ওমা! ওমা!" বলিয়া প্রাণ হরিয়া লইতেছে! অমনি সচকিতে "মা এলি? মা এলি?" বলিয়া বহির্দ্বারে ধাবিতা হইতেছেন, অমনি না দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইতেছেন! আবার চেতনা হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। কখন বা দূত, অমাত্য, ভৃত্যাদিকে কত অর্থ দিয়া, কত বিনয় করিয়া

প্রাণের উমা আনয়নের নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন। কখন বা স্থূল তনু ত্যাগ করিয়া স্বয়ংই উমার নিকট গমন করার অভিলাষে বিষপানে উদ্যতা হইতেছেন। কখন বা উদ্বন্ধনের উদ্যোগ করিতেছেন, কখন বা ভৃগু-পাতের চেষ্টা করিতেছেন!—মহিষীর এইরূপ অবস্থা অবগত হইয়া, গিরিরাজ ম্লানবদনে বিষণ্ণ মনে, ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। মেনাও সর্ব্বাভাবহর প্রাণেশ্বরকে পাইয়া, তাঁহার হাত দুখানি ধরিয়া সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন।—

রাগিণী বেহাগ—ঢিমে আড়া।

আর কবে যাইবে গিরি! প্রাণের উমাকে আনিতে।
আনিব আনিব ব'লে, কেন এ যন্ত্রণানলে,
দহিছ অধীন জনে প্রবঞ্চনা-বচনেতে॥
নিশ্চয় মানস যদি, আনিবে না উমা-নিধি,
বল তবে সত্যভাবে, করি আশা বিসর্জ্জন॥
ধর তবে গিরিবর, এ পাপিনী-কলেবর,
দুখের জীবন তবে, পরিহরি তব হাতে॥
কিন্তু এই নিবেদন, নিবাইলে পঞ্চপ্রাণ,
অভাগিনীর শব দেহ করিও না ভস্মীভূত॥
পরে যদি কোন দিনে, আসে হেথা উমা-ধনে,
দেখাইবে মৃত দেহ, ব'লে সব রীতিমতে॥
না দেখে তার বিধুমুখ, ভাবিয়ে তার গৃহদুখ,
অসহ্য যাতনানলে হইয়ে অধীরা;—
তাহার গর্ভধারিণী, এ মেনকা অভাগিনী,
ত্যজিয়েছে কলেবর, তাকে ভাবিতে ভাবিতে॥

গিরিরাজ।—মহিষি! তুমি যাহা বলিলে তাহা সমস্তই সত্য, প্রাণ-প্রতিমা উমার অদর্শনে আমিও আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়াছি। কিন্তু কি করিব, কোন উপায় দেখিতেছি না। উমার আগমনে আর ভরসা হইতেছে না। প্রিয়ে! তোমার দেহত্যাগের আশঙ্কায় আমি কিছু বলিতে পারি নাই, কিন্তু এখন তুমি আমাকে নিতান্ত অভিযোগ করিতেছ, সুতরাং না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, নিজেও আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিতেছি না। মহিষি! আমি তিন চারিবার প্রাণ-প্রতিমা গৌরীকে আনিতে গিয়াছিলাম, প্রতিবারেই নিরাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। উমার আগমনে জামাতাই নিতান্ত প্রতিকূল, তৎপর কুমার ও হেরম্বও অসম্মত। প্রিয়ে! আমি যত্নের কিছু মাত্র ত্রুটি করি নাই। দেবদেবকে যতদূর বলার বলিয়াছিলাম, অবশেষে কত স্তব স্তোত্র, কত শিরোনতিও করিয়াছিলাম, ষড়ানন গজাননকে ক্রোড়ে করিয়া কত প্রকার প্রবোধও দিয়াছিলাম, কোনমতেই কৃতকার্য্য হইলাম না। তাঁহারা সম্মত হইলেন না। প্রিয়ে! কেবল তাঁহারা নহেন, সেখানে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, হুতাশন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রভৃতি সমস্ত দেবগণই উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও সকলেই আমাদের অভিলাষ সিদ্ধির প্রতিকূল; সুতরাং এবার উমার আগমন নিতান্তই সুকঠিন হইয়াছে। মহিষি! আর এক কথা বলি! তাহা শুনিলে বোধ হয়, তোমার যন্ত্রণার কিছু শান্তি হইবে। প্রিয়ে! যে সকল দেবগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আমার উমার পরিচর্য্যা করিতেছিলেন। কেহ দ্বারবান্, কেহ পার্ষ্ণিরক্ষক, কেহ সম্মুখস্থ, কেহ কোষাধ্যক্ষ, কেহ সিংহরক্ষক, কেহ উদ্যান-

রক্ষক, কেহ দণ্ডধারী, কেহ বা ছত্রধারি-রূপে দণ্ডায়মান ছিলেন। আর কেহ তোমার উমার নিমিত্ত পুষ্পাহরণ করিতেছিলেন, কেহ বস্ত্রাহরণ করিতেছিলেন, কেহ গন্ধ চন্দন, উশীর, আলক্ত, সিন্দুর, অগরু, কস্তূরী প্রভৃতির আহরণ করিতেছিলেন। কেহ উমার উদ্বর্ত্তনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, কেহ উমার স্নানের আয়োজনে ছিলেন, কেহ অলঙ্কারের আসাদনে ব্যাপৃত ছিলেন, কেহ উমার ভোজনের উদ্যোগে নিরত ছিলেন, আর কেহ কেহ আমার উমার নিকট দাঁড়াইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সাশ্রুনয়নে গদ্গদ-কণ্ঠে কত কত স্তব স্তোত্র, কত কত অভিমান, ও আবদারি করিতেছিলেন। প্রিয়ে! তখন কিরূপ সুখসাগরে ডুবিয়াছিলাম, তাহা মুখে প্রকাশ করিতে পারি না। তখন সমস্ত অভাব, সমস্ত বেদনা, যাতনা ভুলিয়া সবিস্ময়ে তাহাই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। রাণি! তুমি যদি একবার তাহা দেখিতে, তবেই সেই আনন্দ-সুধা পান করিতে পাইতে এবং প্রাণের উমা দুঃখে আছে বলিয়া, তোমার যে ভ্রান্তিমূলক অনুতাপাগ্নি প্রজ্বলিত আছে, তাহাও একবারে নির্ব্বাপিত হইত। প্রিয়ে! উমার যে প্রকার বিভব স্বচক্ষে দর্শন করিলাম, তাহা ত্রিলোকের অতীত, ত্রিভুবনে আর কাহারই সেইরূপ বিভব, সেইরূপ ঐশ্বর্য্য নাই! সেইরূপ আনন্দ-ধাম, সেইরূপ পরিবার, সেইরূপ ভৃত্যামাত্য, সেইরূপ পরিচর্য্যা, সেইরূপ বসন ভূষণ, সেইরূপ শয়ন আসন, সেইরূপ উদ্বর্ত্তন, সেই-রূপ সুমজ্জন, এবং সেইরূপ পান ভোজন আর কাহারও হইতে পারে না। মহিষি! আমাকে লোকে রত্নসানু, সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকর ইত্যাদি বলিয়া থাকে। কিন্তু সেইরূপ রত্ন, সেইরূপ বসন ভূষণ, সেই রূপ পান ভোজন, কুসুমাদি আমি কখনও নয়নগোচর করিনাই!

প্রিয়ে! একেত উমা আমার আনন্দ-প্রতিমা, তাহাতে আবার আনন্দ-কাননে, আনন্দ-ধামে আনন্দ-পীঠেই বসতি; তাহাতে আবার সেই সকল বসন ভূষণাদির শোভা—এই সমস্তের সম্মিলনে কিরূপ আনন্দলহরী উঠিয়াছিল, তাহা স্বনয়নে না দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না। রাণি! সেই হৃদয়-ভরা, নয়ন-ভরা রূপ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। প্রিয়ে! সে রূপের ছবি ক্ষুদ্রায়তন এই পার্থিব নয়নে পার্থিব হৃদয়ে ধরে না, যে টুকু ধরে সেই টুকুও এই মাটির হৃদয়ে, মাটির চক্ষে ধারণ করিতে যেন লজ্জা ও আশঙ্কা বোধ হয়! এই জড় নয়নে, জড় হৃদয়ে আসিয়া, পাছে সেই অলৌকিক রূপের কিরণ মলিন হইয়া যায়, পাছে জড় হইয়া যায়, পাছে ক্ষুদ্র হইয়া যায়, ইত্যাদি নানাবিধ আশঙ্কা উপস্থিত হয়। তাই সেই সকল দেবগণই দুর্নিবার প্রতিকূল হইয়া আমার উমাকে এই মলিন পার্থিব রাজ্যে আসিতে দিলেন না। এবং আমাকে নানারূপ অনুনয় বিনয় করিয়া নিবৃত্ত করিয়া দিলেন। প্রিয়ে! ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সমস্ত দেবগণই নাকি তোমার গৌরীর তনয়, গৌরী নাকি অন্তরূপে তাঁহাদের সকলকেই প্রসব করিয়াছিল, কেবল তাহাও নয়, বিষ্ণুদেব বলিলেন, এই ত্রিভুবনে যে কেহ আছে, সকলেই উমার তনয় তনয়া। উমা নাকি প্রত্যেক নারীতে প্রবেশ করিয়া, এই জড়দেহের অন্তরালে থাকিয়া সকলকেই প্রসব ও পালনাদি করে। তাই তোমার উমা ত্রিভুবনের মা এবং তুমি আর আমি এই ত্রিভুবনের মাতামহী মাতামহ। সেইজন্যই দেবগণ আবদারি করিয়া আমার উমাকে আসিতে দিলেন না এবং উমাও তাহা উপেক্ষা করিতে সমর্থা হইল না।

দেবগণ আমাকে বলিলেন, গিরিরাজ ! আপনি প্রতিনিবৃত্ত হউন, মাকে আর পৃথিবীতে যাইতে দিব না। আপনার একান্ত আগ্রহে, আপনার আনন্দ সাধনের নিমিত্ত অনেকবার মাকে পাঠাইয়া, মায়ের সঙ্গে গিয়া আমরা নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। অতএব এবার আর অনুরোধ রক্ষা হইবে না। মা এবার কিছু-তেই যাইতে পারিবেন না, অবশ্যই আপনার বিশেষ কোন অপরাধ বা ত্রুটি নাই সত্য, কিন্তু অন্যের অপরাধে আপনি দোষী হইয়াছেন। মা আপনার ভবনে গমন করিলে, সেই লক্ষ্যে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও পদার্পণ করিতে হয়। আমরাও কেহ প্রকাশ্যে, কেহ অন্তরালে সকলেই মায়ের অনুগমন করিয়া থাকি। সেই সময়ে নানাস্থানের নানাজনের নানাবিধ আহ্বান আবদারিতে মাও নিতান্ত অধীরা থাকেন। আমরাও সকলে অস্থির ভাবে কালযাপন করি। সে যাহা হউক, তাহাতে বিশেষ দুঃখিত নহি, কিন্তু স্থানে স্থানে মায়ের নামে নানাপ্রকার অত্যাচার দেখিয়া নিতান্তই ব্যথিত হইতে হয়, ক্রোধেরও উত্তেজনা হয়, তখন পৃথিবী-মণ্ডলকে রসাতলে নিমগ্ন করিয়া শান্তিলাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে। গতবারে দুই চারি জন ভক্তের আগ্রহে সেই নরকভূমি বঙ্গভূমিতে মাকে যাইতে হইয়াছিল, তাহাতে যেরূপ দৃশ্য নয়নগোচর হইল, তাহা মনে করিলে এখনই বঙ্গদেশকে ভস্মীভূত করিতে প্রবৃত্তি হয়। দেখিলাম, কত কত নরাধম মায়ের প্রতিমা বলিয়া এক একটা পুত্তল দাঁড় করাইয়া, তাহাকে এক একটা ফিরিঙ্গিণী বেশে সাজা-ইয়াছে ! কেহ বা রাঙ্‌ চুমকি রাঙ্‌তা অভ্র সোলা সিসকাদি দ্বারা সেই পুত্তলটাকে নানা প্রকারে বিজড়িত করিয়াছে।

আবার কত শত শত পশু, দল বল লইয়া তাহার নিকট বসিয়া বারাঙ্গনা ক্রীড়া করিতেছে! কেহ বা সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া পশুলীলা সাধন করিতেছে! তৎপর সেই পুত্তলের নিকটে বস্ত্রালঙ্কারাদি যে সকল উপহার উপস্থিত করিল, তাহাও নিতান্তই যাতনাবহ হইয়া উঠিয়াছিল। এবং যেরূপ দর্পান্ধ হইয়া অবহেলার ভাব, অভিমানের ভাব প্রদর্শন করিল, তাহা দর্শন করিয়া দক্ষের শাসন কর্ত্তা বীরভদ্রকে স্মরণ করিয়াছিলাম। ইহার পরে, আবার পুরোহিতের অভিনয়গুলি দৃষ্টিগোচর হইয়া নিদারুণ বেদনা দিয়াছিল। অবশ্যই ঐরূপ স্থানে মা কখনই পদার্পণ করেন নাই সত্য, কিন্তু মায়ের নাম লইয়া যখন ঐ সকল পশ্বাচার করে, তখন মায়ের তনয়-বর্গে তাহা কিরূপে সহ্য করিবে! তাই সেই দিন হুতাশন দেব সমীরণের সহিত একত্রিত হইয়া ঢাকা ও বিক্রমপুরের স্থানে স্থানে সর্ব্বনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং ভূমিকম্পের দ্বারা বঙ্গ প্রদেশকে স্বর্গবিল করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে মায়ের নিষেধে বাধ্য হইয়া কথঞ্চিৎ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের ক্রোধের কালিমা বিধুত হয় নাই। আজও তাঁহারা মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে নানাবিধ শাসন করিয়া থাকেন। কেবল তাঁহারাই নহেন, সূর্য্যদেবও দেবরাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া অতিরৌদ্র ও অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্ট্যাদির দ্বারা নানারূপ শাসন করিতেছেন। মা নিবারণ করিলেও তাঁহারা একেবারে সুস্থ হইয়া থাকিতেছেন না। তাই বলি, মাতামহদেব! আপনি গৃহে গমন করুন, মায়ের আর পৃথিবীতে যাওয়া হইবে না। আপনি বারম্বার গতায়াতের ক্লেশ করিবেন না। আমরা মায়ের আর বিড়ম্বনা

সহ্য করিতে পারিব না। আপনারও অকালে সৃষ্টিনাশ প্রার্থনীয় নহে।

প্রিয়ে! আমি যতবার গিয়াছি, প্রতিবারেই বিবুধগণের দ্বারা এইরূপে ভগ্নাশ হইয়া, শিরে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে প্রত্যাগমন করিয়াছি। উমার নিকটে কত ক্রন্দন করিয়াছি, তোমার অবস্থাও যথোচিত জানাইয়াছি, কিন্তু উমা দেবগণ ও জামাতার প্রতিবন্ধক উপেক্ষা করিতে পারিল না। অতএব উমার আসা হইবে না। প্রিয়ে! আর উমার আসা হইবে না! আর তোমার উমা-দর্শন ঘটিবে না।—এই বলিয়া, উভয়ে উভয়ের গল গ্রহণ করিয়া সাশ্রু নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

এদিকে নারদ মহর্ষি মধুর বীণা-তানে মধুর স্বর মিলাইয়া মায়ের গুণ গান করিতে করিতে বিমানপথে কৈলাসধামে গমন করিতেছেন।—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

কে ও রমণী, নাচে একাকিনী, পাগলিনী বেশে দনুজ-সমাজে।
নীলবরণী, যেন সৌদামিনী, জলদপটলে আঁধার নাশিছে॥
সুধাকর দেখি পদ-সুধা পেয়ে, গলিয়ে পড়িছে দশধা হইয়ে,
তাহে পাণ্ডুরাগে হইয়ে রঞ্জিত, আ মরি! আ মরি! কি শোভা ধরিছে॥

বিশাল নিতম্বে নরকর-হাড়, খসিতে খসিতে পেয়েছে আধার,
ত্রিবলি-বলয়ে সুগম্ভীর নাভি, (যেন) কালিন্দী-তরঙ্গে পঙ্কজ
ফুটিছে॥
তনয়ের তাপে হইয়া তরল, ঘনীভূত স্নেহ নির্ম্মল ধবল,
না ধ'রে হৃদয়ে দেখ পয় হ'য়ে, গজকুম্ভাকারে উন্নত করিছে॥
কম্বু কণ্ঠ তাতে মুণ্ডমালা দোলে,
দেখি শোভারাশি শ্রীমুখমণ্ডলে,
ত্যজি বিম্বাম্বুজ সুধানিধি-বিম্ব, আসি শোভার আশে আশয়
লয়েছে॥
চিক্কণ ঘন নিবিড় শ্যামল, এলো থেলো দেখি কুটিল কুন্তল,
লোল রসনে করাল দশনে, বিকট হসনে ত্রিলোকী ত্রাসিছে॥
ক্রোধে বিঘূর্ণিত লোহিত নয়নে, বিদ্যুৎরাশি ছুটিছে সঘনে,
দেখি দহিতেছে যেন ত্রিভুবনে, অকালে প্রলয় ঘটনা ঘটিছে॥
পদভরে ধরা কাঁপে ঘন ঘন, চূর্ণিত হইছে ধরাধরগণ,
জলধি-তরঙ্গে প্লাবিতেছে ধরা, সঞ্চার পবনে প্রলয় করিছে॥
উল্লম্ফে বিকম্পে রবি শশী তারা, কেশাঘাতে কেহ
পড়িতেছে ধরা,
সৌদামিনী-রাশি অসিতে নাশিছে, একাঘাতে লক্ষ দনুজ
নাশিছে॥
পদাঘাতে কত করিছে বিনাশ, কত রথরথী করিতেছে ত্রাস,
রুধিরের নদী বহিছে তরঙ্গে, রঙ্গভূমি দেখি রুধিরে ডুবিছে॥
ব্রহ্মাদি বিবুধ হ'য়ে কৃতাঞ্জলি, স্তবন করিছে "রক্ষ রক্ষ" বলি,
যোগী ঋষিগণ হ'য়ে কুতূহলী, জবা পুষ্পাঞ্জলি চরণে ঢালিছে॥

এই গানটী শেষ হইতে হইতে, দেবর্ষির হঠাৎ অধোভাগে দৃষ্টি-

পাত হইল। দেখিলেন, মাতামহ-গিরিরাজের রাজধানীর ঊর্দ্ধ-গগণে উপনীত হইয়াছেন। তখন গিরিরাজের সহিত একবার সাক্ষাৎ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। মনে করিলেন, মাতুলালয়ের সন্নিহিত পথে, যখন মায়ের নিকট যাওয়া হইতেছে, তখন মা এখানকার কোন সংবাদ-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সুতরাং তাহা জানিয়া যাওয়াই উচিত। নতুবা, মা দুঃখিতা হইতে পারেন।

এই ভাবিয়া ধীরে ধীরে গিরিরাজ ও গিরি-রাজ্ঞীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। এবং যথাবিধি সংকারান্তে, তাঁহাদের সমস্ত অবস্থা শ্রবণ করিলেন। অনন্তর নানা প্রকার সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া, অভিমত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কৈলাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

নারদ (মনে মনে) গিরিরাজ ও গিরিপত্নীর যেরূপ অবস্থা "দেখিলাম, তদ্দ্বারাই বোধ হয়, আমার অভিলাষ পরিপুর্ণ হইবে। বিশেষতঃ, মেনকার এই ঐকান্তিক অনুরাগকে, মা উপেক্ষা করিবেন, ইহা কোনমতেই সম্ভাব্য বিবেচনা হয় না। এবার মেনা হইতেই, বোধ হয়, মায়ের চরণ স্পর্শ লাভ করিয়া, ধরণী আয়ুষ্মতী হইবেন। অতএব এই পন্থাটিই একটু পরিষ্কৃত করার চেষ্টা পাইতে হইবে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্ষণকাল মধ্যেই, সেই ধরণী-শুভার্থী দেবর্ষি কৈলাস ধামে উপনীত হইলেন। অনন্তর দ্বার-দেবতাগণের সহিত যথাবিধি সৎকার সম্ভাষণান্তে দেবদেবের চরণ-যুগল দর্শন স্পর্শন করিয়া, একান্তে সমাসীনা ত্রিলোক-জননীর সন্নিধানে সমাগত হইলেন। আনন্দময়ীর নিত্যানন্দা-

লয়ে উপস্থিত হইয়া নারদ, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং সেই চতুর্ব্বর্গপ্রদ চরণ-কমল-দুটিতে জটা-মণ্ডিত মস্তকটি লুণ্ঠিত করিয়া, সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ভক্তবৎসলা জগজ্জননী প্রিয়তনয় সন্দর্শনে সহর্ষে তাঁহার শিরোঘ্রাণাদি মঙ্গলাচরণ করিলেন এবং আসন পরিগ্রহে অনুমতি করিয়া মাঙ্গলিক প্রশ্ন করিলেন। দেবর্ষিও মায়ের স্নেহ-মাখা সৎকারে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া, আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক উত্তর বাক্য বলিতে লাগিলেন।—

নারদ।—মা! আমার তো মা ব্যতীত আর কোনই সম্পত্তি নাই, অতএব আনন্দময়ী মায়ের কুশলই তো আমার কুশল!

জগদম্বা।—বৎস্য! এই জন্যই সকলে তোমাকে জীবন্মুক্ত বলে। বাবা! এখন কোথা হইতে আসিলে?

নারদ।—আসিলাম ব্রহ্মলোক হইতেই, তবে মধ্যে মাতা-মহ গিরিরাজের দর্শনার্থে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। এখন সেই-খান হইতেই আগমন করিয়াছি।

জগদম্বা।—(স্নেহার্দ্র নয়নে) নারদ! তুমি গিরিপুরে অবরোহণ করিয়াছিলে! জনক জননীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া-ছিল তো? বাবা! আমার সেই স্নেহময় পিতা, এবং মদ্গত-প্রাণা জননী কেমন আছেন?—বল দেখি।

নারদ।—জ্ঞানময়ি! আপনার অবিদিত কিছুই তো নাই, তবে আমাকে জিজ্ঞাসিতেছেন কেন? হউক, তথাপি আজ্ঞা-ধীনের আজ্ঞা পালন ব্যতীত হেতুবাদে অধিকার নাই, অতএব তাহাই করা যাইতেছে। জননি! আপনার পিতা মাতার অবস্থা বর্ণনীয় নহে। তাঁহাদিগকে যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছি,

তাহাতে এতকাল জীবিত আছেন বলিয়াই মনে হইতেছে না। সর্ব্বেশ্বরি! আপনার জনক জননী, আপনাতেই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া, কেবল শবাকার দেহভার মাত্র বহন করিতেছেন! তাঁহাদের উভয়েরই ক্ষুধা পিপাসা নাই, আহার নিদ্রাও নাই, অন্য কোন কার্য্যও নাই, কেবল আপনাকেই প্রাণের ভিত্তি করিয়া দিবারাত্র অতীত করিতেছেন। তাঁহাদের ধ্যানে উমা, জ্ঞানে উমা, নয়নে উমা, স্বপ্নে উমা, উমা ব্যতীত আর কিছুই নাই। মাতঃ! আপনি সেখানে না থাকিলেও তাঁহারা নয়নের দ্বারা আপনাকেই দেখিতেছেন, শ্রবণেও আপনার কথা শুনিতেছন, আপনিই তাঁহাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্ব-প্রাণের বন্ধন-স্তম্ভ-স্বরূপা হইয়াছেন। তন্মধ্যে আবার, সেই গিরি-পত্নীর অবস্থা আরও সুদুঃসহা। ত্রিলোকজননি! আপনার জননীর অবস্থা দেখিলে, কোনমতেই ধৈর্য্য রাখা যায় না। তাঁহার উমা-বিয়োগ যাতনানল পরিদীপ্ত হইয়া, অচেতন তরু-লতাগণকেও যেন চেতনাবান্ করিতেছে! তিনি উন্মাদিনী হইয়া সর্ব্বজ্ঞান-পরিশূন্যা হইয়াছেন। জননি! মেনার সেই শোচনীয়া অবস্থা বর্ণনীয়া নহে। তাঁহার সমস্তই এখন উমাময় হইয়া উঠি-য়াছে। তিনি যেখানে আপনার সৌন্দর্য্যাদির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিতে পান, সেইখানেই উমাজ্ঞান করিয়া পদে পদে বিড়ম্বিতা হইতেছেন। তিনি কখনও সেই সুবর্ণময় কন্দুকের মুখে "মা খাও, মা খাও" বলিয়া পায়স দান করিতেছেন, কখনো বা সেই চিত্রপুত্তলীগুলিকেই "উমা উমা" বলিয়া শিরোঘ্রাণ ও মুখ চুম্বন করিতেছেন, কখনো বা আপনার সেই বাল্যলীলার উদ্যানে গিয়া, কুসুম-স্তবকবতী মালতী লতাকেই "উমা উমা" বলিয়া বক্ষে

লইতেছেন, আবার রজনীতে গিরিশিখরের উর্দ্ধ-গগণে সুধাংশু-মণ্ডল দেখিয়া "ঐ উমা—ঐ উমা" বলিয়া শিখরারোহণের চেষ্টা করিতেছেন, আবার অধোদৃষ্টিকালে সেই ভাগীরথী-সলিলে সুধাকরের প্রতিবিম্ব দেখিয়া "উমা ডুবিল—উমা ডুবিল" বলিয়া নিমগ্না হইতেছেন।—এইরূপ আরও কত কিছু করিতেছেন, কত কিছু বলিতেছেন, তাহার বর্ণনা করা যায় না। জ্ঞানময়ি! আপনি সমস্তই অবগতা আছেন। কিন্তু দয়াময়ি! সেই সরলানুরাগিণী জননীর এইরূপ ব্যসনাবস্থা দেখিয়াও আপনার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের বিন্দুমাত্র স্নেহও স্পন্দিত হয় না কি?

জগদম্বা।—(স্নেহসিক্ত-নয়নে) বৎস! আমি সমস্তই জানিতেছি, তাহা সত্য; জনক-জননীর তাদৃশ করুণাবস্থা যে আমাকে সমাকৃষ্টা করিতেছে, তাহাও মিথ্যা নহে। কিন্তু নারদ! দেবদেবের অভিমত উল্লঙ্ঘনে আমি সমর্থা নহি। দেবর্ষে! তুমি তো বিদিত আছ, আমার অপর নাম "সতী"। পতিব্রতাগণ আমার দৃষ্টান্তের কিয়দংশ লাভ করিলেই "সতী" নামে অভিহিতা হয়। অতএব, আমি স্বয়ং কেমন করিয়া পতির অভিপ্রায়ের প্রতিকূলা হইব? তাহা হইলে, পতিব্রতাগণ কাহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে? তাই এবার আমার পিত্রালয়ে যাওয়া ঘটিতেছে না।

নারদ।—সত্যরূপিণি! আপনার সমস্তই সত্য, কিন্তু মা! "উমা-উমা" বলিয়া প্রাণত্যাগ হইলেও আপনার দর্শন লাভ হইবে না, ইহারও তো উদাহরণ নাই! সে হউক, আপনি স্বতন্ত্রা এবং ইচ্ছাময়ী। আপনার ইচ্ছা কোনমতে ব্যাহত হইবার নহে। কিন্তু, জননি! তাদৃশানুরাগিণী মেনকার বিড়ম্বনা দেখিয়া

নিজের বিষয়ে বড় ভীত হইয়াছি! তাই, ঐ চরণোপান্তে আমার সর্ব্বপ্রাণের প্রার্থনা এই যে, অন্তকালে যেন ঐ চরণযুগল হইতে বঞ্চিত না হই!

এইরূপ বলিতে বলিতে, সেই ব্রহ্মশাপের প্রভাব নারদকে অধীর করিয়া তুলিল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না! তাঁহার মন অন্যত্র গন্তকাম হইল, তখন সজল-নয়নে কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিতে লাগিলেন।—

নারদ।—জননি! দারুণ ব্রহ্মশাপ আমাকে চরণ-সুধাপানে বঞ্চিত করিল! তাহার অদম্য প্রভাবে আমি কোনখানেই মুহূর্ত্তাধিক অবস্থিতি করিতে পারি না,—তাই এখনই ঐ চতুর্ব্বর্গের কল্পতরু চরণ দুখানি উপেক্ষা করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিতে হইল, আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

এই বলিয়া, মৌলির দ্বারা মায়ের চরণরেণু গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মনোরথগামী দেবর্ষি ক্ষণকাল মধ্যেই সেই হিমালয়ের ঊর্দ্ধাকাশে আসিয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন।—

নারদ।—(মনে মনে) মায়ের শুভাগমনের অন্তরায় যেরূপ সুদৃঢ়, তাহাতে মেনকার তাদৃশী ঐকান্তিকী ভক্তিও যে তাহা বিচলিত করিতে সমর্থ হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। মা সহজে কিছুতেই পতির অভিপ্রায়ে প্রতিকূলা হইবেন না। অতএব, গিরিপত্নীর অনুরাগ আরো একটু উচ্ছ্বসিত করিতে হইবে,—উমাবিয়োগে যাহাতে তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তাহা করিতে হইবে। ভক্তের প্রাণাত্যয়-কালে, বোধ হয়, সহস্র বাধা বিঘ্ন থাকিলেও, ভক্তপ্রাণা মা স্থির থাকিতে সমর্থা হইবেন না। অতএব তাহাই করা যাউক।

এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ, গিরিরাজ-রাজধানীতে অবতীর্ণ হইয়া, অন্তঃপুরচারিণী মেনকার নিকট উপনীত হইলেন। তখন সেই উমা-প্রেমোন্মাদিনী উমা-প্রাণা গিরিপত্নী উমা-পুর-প্রত্যাগত নারদকে পাইয়া, হর্ষবিষাদ-জড়িত একরূপ অভিনব ভাব-তরঙ্গে উদ্বেলিতা হইলেন! তখন তাঁহার সেই উমা-বিয়োগ-যাতনা দ্বিগুণতর স্ফীতা হইয়া উঠিল, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন কি একরূপ হর্ষেরও সম্মূর্চ্ছনা হইল! এইরূপ ভাবের বিক্ষোভে ক্ষণকাল স্তব্ধবৎ থাকিয়া গিরিরাণী বাঙ্নিবেদনে সমর্থা হইলেন, এবং দেবর্ষির চরণ বন্দন ও আসন দান করিয়া সজলনয়নে জড়িতস্বরে উমার বার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন :—

মেনকা।—ভগবন্! আপনি আমায় উমার নিকট হইতে আসিলেন ত? আমার প্রাণের ধন উমা কেমন আছে? তাহার সেই সুবর্ণময়ী তনু-লতাটি ভাল আছে ত? দেবর্ষে! উমার সংসারের অবস্থা কি সেইরূপই আছে? গিরিরাজ যে তাহার অতুল সুখ-ভোগের বিষয় বলিয়াছেন, তাহা কি আমার সান্ত্বনামাত্রের নিমিত্ত? তপোধন! উমা আমার কথা কিছু বলিল কি?

নারদ।—শিখরিণি! আমি আপনার উমার নিকট হইতেই আসিলাম সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত অবস্থার কথা আপনার নিকট বলিতে সমর্থ নহি। রাজ্ঞি! যাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র মায়া মমতা আছে, সে আপনার উমার যথার্থ অবস্থা বলিতে পারেনা। তাহার মমতা-জড়িত নয়ন সে অবস্থা দেখিতে পারে না, বলিতে গেলেও বাগিন্দ্রিয় স্থগিত হইয়া পড়ে। অধিক কি, মমতাযুক্ত হৃদয়ে তাহা ভাবিতেও অসমর্থ হয়! তাহা ভাবিতে গেলে

হৃদয়গ্রন্থি (কর্ম্মাশয়) ছিন্ন ভিন্ন হয়! সরলে! আপনি আমাকে একান্ত অনুরোধ বরিতেছেন, তাই কথঞ্চিৎ কিছু বলা যাইতেছে। শৈলেশ্বরি! আপনার উমার সেই তনুযষ্টি নাই বলিলেই হয়! তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, কেবল চৈতন্যমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আপনার জামাতা আবার সেই তনুরই আবরণ করিতে পারিতেছেন না। তিনি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সমাচ্ছাদনের যোগ্য একখানি বস্ত্র জুঠিয়া দিতে অসমর্থ। তাই উমা একরূপ দিগ্‌বসনা হইয়াই কালাতিপাত করিতেছেন। এদিকে আবার স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া একটু অকৃত্রিম আনন্দানুভব করিবেন, এমত একটু স্থানও নাই! তাই এখন শ্মশানকেই সার করিয়াছেন। ইহার পর, আহা-রের কথা বলিবার আর প্রয়োজন নাই। গিরীশ্বরি! এই যে, উমা পৃথিবীর কোন বস্তুকেই মন্দ বলিয়া ঘৃণা করেন না; তথাপি তাঁহার সেই দুর্দ্দর্শ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে, বোধ হয়, এজন্মেও তোমার উমা উদর-পূর্ণ আহার করিতে পান নাই! উদর পূর্ণ কেন, কিছু খাইয়াছেন বলিয়াই বিবেচনা হয় না। তৎপর অন্যান্য সুখের কথা আর কি বলিব? গিরি-মহিষি! আপনার উমা নিজেই কেবল আনন্দময়ী, কিন্তু সংসার সুখের কোনরূপ আনন্দ যে তাঁহাকে কখনো স্পর্শ করিয়াছে,এমনো বিবেচনা হয় না।—ইহাই তাঁহার অবস্থার সঙ্ক্ষিপ্ত বর্ণনা *। আমি এইরূপই দর্শন করিয়া আসিলাম। গিরিরাজ যাহা বলিয়াছেন, তাহা আপনার সান্ত্বনা-মাত্র না হইলেও, বোধ হয়, উমা বিয়োগ-জনিত চিত্তবিভ্রমের

---

* পাঠক! বেদান্তের ব্রহ্মস্বরূপ-নিরূপণের কথাগুলি স্মরণ করিয়া, দেবর্ষি নারদের বর্ণনাটি পাঠ করিবেন।

সমুচ্ছ্বাসমাত্র। রাজ্ঞি! তিনি আমার নিকট আপনাদের কথা শুনিয়া আর্দ্রনয়নে কত কিছু বলিলেন, কত কিছু শুনিলেন, এবং আসিবার জন্য ব্যগ্রতাও করিলেন, কিন্তু আপনার জামাতাই তৎপক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল। সেইজন্য তাহা ঘটিতেছে না, নতুবা আমিই উমা মাকে লইয়া আসিতাম।

কিন্তু তাই বলিয়া আপনার এত অধৈর্য্য হওয়া উচিত নহে। এ সংসারে পুত্রকন্যা পরিবারাদি সমস্তই মিথ্যা। একটু ভাবিয়া দেখিলে এই দেহের সঙ্গেই যখন কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই, তখন পুত্রকন্যার সহিত আর কেমন করিয়া আত্মীয়তা হইবে? তাই বলি, আপনি স্থিরা হউন, শান্তা হউন। "উমা উমা" বলিয়া আর দেহটাকে নষ্ট করিবেন না। রাজ্ঞি! আপনার মঙ্গল হউক, আমি এইক্ষণে চলিলাম।

এই বলিয়া, দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মলোকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মেনকারও হৃদয়ের অবশিষ্ট জীবনী শক্তিটুকু প্রস্থানোন্মুখী হইল। একে রাণী উমা-বিয়োগে মৃতপ্রায়া তাহাতে আবার উমার ঐরূপ সুদারুণ কষ্টের কথা শুনিলেন, এখন কোন্ আশায় জীবনীশক্তি থাকিবে! তিনি এতদিন সেই সুদুঃসহ বিয়োগানলে দহ্যমানা হইয়াও, উমার অপার বিভব-সুখের কথা শুনিয়া, সেই আনন্দ-সুধাবলম্বনেই কথঞ্চিৎ জীবিতা ছিলেন। কিন্তু এখন দেবর্ষি কথার দ্বারা তাহাও একবারেই বিশুষ্ক হইল; এখন আর কিসের দ্বারা জীবন রক্ষা হইবে! এখন নারদ-মুখে বিজ্ঞাপিত, উমার একে একটি দুরবস্থার কথা মনে হইয়া, তাঁহার শোকাগ্নি দ্বিগুণ ত্রিগুণ সন্ধুক্ষিত হইতে লাগিল। প্রাণের উমার উদর-পূর্ণ আহার ঘটে না, ইহা মনে হইয়া মেনার হৃদয়ের জল পরিশুষ্ক হইল; আবাসা-

ভাবে উমার শ্মশান-বাস মনে হইয়া, তাঁহার জীবনাবাস শূন্য হইয়া পড়িল; সেই ননীর পুতলী উমার চৈতন্যমাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহার দ্বারা মেনকার সর্ব্বেন্দ্রিয়-চৈতন্য বিলুপ্ত হইল! এইরূপ এক এক কথার স্মরণের দ্বারা এক একরূপ ব্যসনের পারদীপন হইয়া, রাণীর সর্ব্বেন্দ্রিয়, সর্ব্বপ্রাণ ও সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন করিল। তাঁহার শ্বাস-যন্ত্র অবরুদ্ধবৎ হইল, রুধির-প্রবাহ প্রক্ষীণ হইল। কিন্তু নারদের শেষের কথাগুলি তাঁহার পরিতপ্ত হৃদয়ের নিকটবর্ত্তী হইতেও সমর্থ হইল না। তখন সেই অনন্যশরণা মেনকার তনুযষ্টি বেপমান হইতে হইতে, ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মৃত্তিকার শরণ লইল। তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা অস্তমিতা হইল, নয়নাদি সর্ব্বেন্দ্রিয় নিমীলিত হইল, এবং সেই শবাকার দেহের মুখ-কুহর হইতে, মৃদুস্বরে—"উমা উমা" কথাটী অগ্রে লইয়া, ক্ষণে ক্ষণে দুই তিনটী করিয়া নিশ্বাস বহিতে লাগিল! তখন সখীগণ ও দাসীগণের "হা রাণী,—হা মা,—হা উমা" ইত্যাদিরূপ কোলাহলে অন্তঃপুর সমাকুল করিয়া তুলিল।

এদিকে, সেই ত্রিলোক-জননীর স্নেহভরা হৃদয় যেন কেমন করিতে লাগিল, সেই স্নেহরসের সাগর যেন পরিক্ষাত ও বিক্ষোভিত হইয়া হৃদয় মধ্যে ধরিতে লাগিল না, উহা যেন সেই হৃদয়াবরণ ছাপাইয়া উঠিল, তরঙ্গে তরঙ্গে যেন উহা কম্পিত হইতে লাগিল! আনন্দময়ীর—আনন্দময় শ্রীমুখমণ্ডলে যেন উদ্বেগ কালিমার সংস্পর্শ হইল, সেই সুপ্রসন্ন ত্রিনয়ন যেন উৎকণ্ঠার চাঞ্চল্যে কলুষিত হইল! তখন দুর্গতিহরা, ধীরে ধীরে জগৎপিতার সন্নিহিতা হইয়া, মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন।—

জগন্মাতা।—ত্রিলোকনাথ! আপনি প্রসন্ন হউন, এইবারের

জন্য আমার পৃথিবী-গমন অনুমোদন করুন। অধীশ্বর! গিরি-রাজ, গিরিপত্নী আমার বৎসলা-ভাবের ভক্ত, তাহা আপনার অবিদিত নাই। তন্মধ্যে, গিরিপত্নী আজ দুঃসহ জীবন-ব্যসনে নিপতিতা! তিনি এতদিন পর্য্যন্ত আমার বিয়োগ-ব্যসন অনুভব করিয়াও কথঞ্চিৎ জীবিতা ছিলেন। কিন্তু আজ সপ্তমীর দিন উপস্থিত, তাহাতে আবার দেবর্ষি নারদের সেই সত্য বাক্যা-বলীর অতত্ত্বর্থ-সমুদ্ভাসিত উচ্ছ্বাসাগ্নি পরিদীপ্ত হইয়া তাঁহাকে একবারেই বিসংজ্ঞা করিয়াছে, তিনি এখন মৃত্যু-শয্যায় শয়িতা। তাঁহার সেই মহাশ্বাস-উদ্ভাসিত "উমা উমা" ধ্বনি আসিয়া আমার হৃদয় উদ্বেলিত করিতেছে, আমি আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিতেছি না! দেবদেব! এই দেখুন, আমার—কিরূপ অবস্থা হইয়াছে! আমি কোন মতেই মেনকার নিকট না গিয়া আত্ম-ত্রাণে সমর্থা হইব না। অতএব আপনি প্রসন্ন হউন, তিন দিনের জন্য আমার ধরাস্পর্শ অনুমোদন করুন। নতুবা, বোধ হয়, এই দেহ এখানে রাখিয়া আমাকে যাইতে হইবে।

জগৎপিতা।—জ্ঞানময়ি! যে কারণে তোমার পৃথিবী স্পর্শ আমার অনভিমত, তাহা অবগতা আছ। এখন মহাপ্রলয় না হইলে, ত্রিলোকের মঙ্গল বিধান হয় না। অতএব, সর্ব্ব মঙ্গল্যে! তুমি স্থিরা হও, শান্তা হও। আনন্দময়ি! সু-প্রসন্না হও। তোমার চরণের ধরণী-স্পর্শ এখন কোনমতেই সুবিধেয় নহে।

এইরূপ নানাবিধ সান্ত্বনা-বাক্যে, দেবদেব সেই শান্তি-রূপিণীকে শান্তা করিতেছেন। অপর দিকে, সেই মৃত্যু ব্যবনা মেনকা মুহূর্ত্তকাল পর কথঞ্চিৎ সংজ্ঞাবতী হইয়া, এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন।—

মেনকা।—প্রাণ-প্রতিমে! তুমি কোথায় লুকাইলে! ননীর পুতুল! ক্ষণকাল মধ্যে কোন্ থানে অন্তর্দ্ধান করিলে! এই না তোমায় কোলে করিয়াছিলাম! মাগো! কে তোকে আমার কোল হইতে লইয়া গেল! যদি তাহাই করিল, তবে সঙ্গে সঙ্গে অভাগিনীকে লইল না কেন, ইহাকে রাখিয়া গেল কেন! ছার জীবন তুমি প্রাণের উমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্ প্রাণে এই দেহের মধ্যে আসিলে! কোন্ সাধে ইহার আশ্রয় লইলে? হতভাগ্য জীবন! তুমি কি নিমিত্ত আমার উমা-ধনের সঙ্গে সঙ্গে লুকাইলে না! কি জন্য আমার এই মৃতদেহে ফিরিয়া আসিলে? তুমিই কি আমার উমা-লাভের প্রতিকূল? তুমি কোন্ বাদ-সাধনের নিমিত্ত আমার শত্রু পক্ষে নিপতিত হইলে? হও, আমি তবে সত্বরই ইহার প্রতিকার করিতেছি। আমি উমা-শূন্য তোমাকে ক্ষণকালের জন্যও কামনা করি না, আমি এখনই তোমায় বিসর্জ্জন করিয়া প্রাণের উমার নিকট যাইব।

এই বলিয়া শিখরিণী, মুহূর্ত্তের জন্য সখীগণকে অন্তরিত করিয়া, সেই ধূল্যবলুণ্ঠিতা শরীর-যষ্টি কথঞ্চিৎ উত্থিত করিলেন। অনন্তর, উত্তরীয় বস্ত্রে উদ্বন্ধন গ্রন্থি দিয়া, অতি কষ্টে অতি যত্নে, খট্টার ঊর্দ্ধস্থিত সুবর্ণময় কঠিকায় তাহার অপর প্রান্ত নিবদ্ধ করিলেন। তৎপর খট্টায় আরোহণ করিয়া, সেই গ্রন্থিটি গলদেশে পরাইয়া সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন।—

গিরিরাণী।—গিরিরাজ! আপনার চিরাপরাধিনী দাসী, জন্মের মত বিদায় লইতেছে। আপনি নিজের অসীম সহিষ্ণুতাগুণে দাসীর সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

প্রাণ-উমা! মাগো! তোর হতভাগিনী মাকে আর দেখিতে

পাইলি না। মাগো! আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণ একত্রিত হইয়া প্রতিকূল হইয়াছে। হতভাগিনীকে, সকলেই অসহ্য যাতনানলে দগ্ধ করিতেছে। বিধুমুখি! তোর সেই সুধামাথা মুখখানি দেখিতে না পাইয়া নয়নদ্বয় আমাকে অচেতন করিতেছে, সেই মধুমাথা "মা" কথার অভাবে, শ্রবণ আমার দশ দিক্ শূন্য করিতেছে। মাগো! তোর প্রাণভরা তনুখানি হৃদয়ে ধরিতে না পারিয়া, হৃদয়স্থ প্রাণ আমাকে নিষ্পেষণ করিতেছে! অবশেষে দুরন্ত মন আমার, নারদ মুখে প্রাপ্ত তোর এক একপ্রকার কষ্টের কথা উত্থাপন করিয়া, আমার মর্ম্ম-বন্ধন-গুলি ছিন্নভিন্ন করিতেছে! মাগো! আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, ইহাদের সম্পর্ক রাখিতে পারিতেছি না। তৎপর, এই হতভাগ্য জীবনই আমার সর্ব্বাধিক শত্রু। মাগো! ইহার জন্যই আমি তোকে হারাইতেছি। আমি ক্ষণকাল জীবনশূন্যা হইয়া প্রাণ ভরিয়া তোকে কোলে করিয়াছিলাম, কিন্তু এই জীবন যেই ফিরিয়া আসিল, অমনি তোকে হারাইলাম! অতএব, আমি ইহাদের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলাম। মাগো! এ ছার জীবন অদৃশ্য হইলে, তুই আবার সেইমত আমার প্রাণ ভরিয়া কোলের মধ্যে থাকিবি।

এই বলিয়া গিরিরাণী,—পদতলের খট্টাশ্রয় পরিত্যাগ করিলেন, অমনি সেই তনুযষ্টি শূন্যাশ্রয়া হইয়া উদ্বন্ধনে লম্বমানা হইল। রাণীর সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্বপ্রাণ নিমীলিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধরণী-মণ্ডলই যেন নিষ্প্রাণবৎ হইল! স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বপ্রাণী নিস্তব্ধবৎ হইল! দিগ্দাহ উল্কাপাতে দশদিক্ দগ্ধ হইতে লাগিল! ত্রিভুবন কম্পিত হইতে লাগিল! কৈলাসেশ্বরীর কৈলাসপুরী

সংক্ষুব্ধা হইল! তখন সেই ত্রিলোক-জননী, "দেবদেব! প্রসন্ন হউন, আমি সর্ব্বথা আপনার অভিমত পালনে সমর্থা হইলাম না, এই আমার দেহ আপনার অভিমত রক্ষার নিমিত্ত থাকিল আত্মা গিরিরাণীর আকর্ষণে, সমুড্ডীন হইল।"

এই বলিতে বলিতে তিলার্দ্ধ মধ্যে মায়ের নিকট অবতীর্ণা হইলেন, এবং সেই ম্রিয়মাণ দেহটি উদ্বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া সুধানিষ্যন্দী করামর্ষণের দ্বারা মেনার সেই নিমীলিত প্রাণ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় উজ্জীবিত করিলেন, আর ভুজ-লতার দ্বারা মায়ের কণ্ঠদেশ সমাশ্লেষণ করিয়া, "মা! মা!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তখন সেই সুধামাখা ডাক শুনিয়া মেনকা নয়ন উন্মীলন করিলেন, আর দেখিলেন, সেই প্রাণ-ভরা উমা আসিয়া, স্বর্ণ-পর্য্যঙ্কে তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছে। তখন তাঁহার হৃদয়ভরা স্নেহতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া হৃদয়ক্ষেত্র জড়িত করিয়া ফেলিল। সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্বপ্রাণ সমাবিল করিল, নয়নদ্বয় অশ্রুজলে আকুলিত করিয়া নির্নিমেষ করিল। সুতরাং তিনি, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে, সর্ব্বপ্রাণে মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত সেই উমা-সুধার আস্বাদন করিয়াও, না, সুখ না দুঃখ, না তৃপ্তি, না অতৃপ্তি কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না। অনন্তর গিরিরাণী প্রকৃতিস্থা হইয়া মনের সাধে, মনের মত, প্রাণের উমাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন; এবং শিরোঘ্রাণ মুখ-চুম্বনের দ্বারা জগজ্জননীর বাৎসল্য ক্রিয়া করিয়া সর্ব্ব প্রাণ-সমর্পণে, নয়ন-যুগলের দ্বারা মুহুর্মুহু, উমা-ধনের রূপ-মাধুরী পান করিতে লাগিলেন, আর সুকোমল কর-কমলের দ্বারা উমার সেই সুধামাখা মুখখানি মার্জ্জন করিতে করিতে সজল-নয়নে বলিতে লাগিলেন।—

মেনকা।—মাগো! তুই কেমন করিয়া আসিলি! কাহার সঙ্গে আসিলি! জামাতা তো তোকে আসিতে দেন নাই। হউক, সে সমস্ত পরে শুনিব। পথকষ্ট এবং ক্ষুধাকষ্টে চাঁদমুখখানি শুখাইয়াছে, অতএব, ধর, মা! এই সশর্কর নবনীত-টুকু মুখে লও।

এই বলিয়া, রাণী, সেই ত্রৈলোক্য জননীর শ্রীমুখে নবনীত-দানে উদ্যতা হইলে, জগন্মাতা সান্ত্বনা-স্বরে বলিলেন।—

জগদম্বা।—মা! তোমার দারুণ-ব্যসন দর্শনেই আমার এরূপ অবস্থা হইয়াছে। আমার পথে কোন কষ্ট হয় নাই, ক্ষুধাও হয় নাই। অতএব দেবদেব এবং শ্রীমান্ কুমার আর লম্বোদরের ভোজন হইলেই, আমি খাইব। তাঁহারা অন্যান্য দেবগণসহ পশ্চাৎ আসিতেছেন। তুমি তাঁহাদের সকলেরই উপযুক্ত আহারাদির আয়োজন কর।

অনন্তর মেনকা, আনন্দ-সাগরে ভাসিতে ভসিতে প্রাণের উমাকে কোলে করিয়া, ম্রিয়মাণ প্রাণেশ্বরের নিকট উপনীতা হইলেন, এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিলেন। গিরিরাজও সেই আকাশের চাঁদ হস্তে পাইয়া মুহূর্ত্তকাল আনন্দ-বিহ্বল হইয়া রহি-লেন, অনন্তর উমার বচনানুসারে আহারাদির আয়োজন করিয়া, সপরিবার-দেবদেবের পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে কৈলাস ধামে, ত্রিলোকেশ্বরীর সুবর্ণময়ী তনুলতার অসংজ্ঞাবস্থা দেখিয়া হাহাকারে কোলাহল হইল, ত্রিলোকনাথও সংক্ষুব্ধ হইলেন। অনন্তর অব্যাহত জ্ঞানশক্তি প্রভাবে সমস্ত জানিতে পাইয়া, কুমার, হেরম্ব এবং অন্যান্য দেবগণকে বলিলেন।—

ত্রিলোচন।—বৎস! তোমরা ভীত হইও না। মৃত্যুর মৃত্যু-স্বরূপা ত্রিলোক-বিধাত্রীর কখনো মৃত্যু বা কোনরূপ ব্যসন হইতে পারে না। ভক্তপ্রাণা সতী, ভক্তের গৌরব প্রদর্শনার্থে—এই চিত্র প্রাদুর্ভূত করিয়াছেন। তদ্‌গতপ্রাণা মেনকার মৃত্যু-ব্যসন উপস্থিত হইলে, তিনি মায়ের অপর তনু গ্রহণে হিমালয়ে গমন করিয়াছেন,এবং আমার নিষেধ পালনার্থে এই শববৎ দেহটি রাখিয়া গিয়াছেন। অতএব আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। এখন এই দেহটি লইয়া সকলকেই হিমালয়ে যাইতে হইবে।

এই বলিয়া, দেবদেব, সমস্ত দেবগণ সমভিব্যাহারে, হিমালয়া-লয়ে, যথাবৎ উপস্থিত হইলেন। তখন প্রদীপ-দ্বয়ের সম্মীলনের ন্যায়, ত্রিলোক-জননীর দুটি তনু এক হইয়া গেল। গিরিরাজ, গিরিরাণী ও জামাতা, দৌহিত্র, এবং সমস্ত দেবগণের সহিত উমাকে পাইয়া, আনন্দ-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে তিন দিন পর্য্যন্ত মনের সাধ পরিপূর্ণ করিলেন। অন্যান্য ভক্তগণও, মেনকার প্রসাদে এবার পৃথিবীতে মায়ের শ্রীচরণ দর্শন পাইলেন। এবার এইরূপে পৃথিবীতে জগন্মাতার চরণস্পর্শ হইল।

এখন দেখিতে পাইলে যে, উল্লিখিত চারিটী ঘটনাতেই জগ-জ্জননী কেবল ভক্তির গুণেই সমাকৃষ্টা হইয়াছিলেন, কিন্তু উপ-হারের গুণে নহে। এতদ্ব্যতীত, অন্য সময়েও, যখন যখন জগদম্বার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাও কেবল ভক্তির দ্বারাই সাধিত, কিন্তু কেবল উপহারের দ্বারা নহে। মা ভক্ত প্রাণা,ভক্তিই তাঁহার একমাত্র উপহার। ভক্ত প্রাণ সমর্পণ করিয়া ডাকিলে, মা কখনই স্থির থাকিতে পারেন না। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণুর সহস্রার পরিত্যাগ করি-য়াও, তিনি পত্রের কুটীরে আগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তি

না থাকিলে, এ ছার পৃথিবীর কথা কি বলিব,স্বর্গের সুধা আনিয়া দিলেও ত্রিলোকেশ্বরীর তৃপ্তি সাধন করা যায় না। তদ্দ্বারা তিনি আকৃষ্টাও হয়েন না, তাহা গ্রহণ করেন না। ভক্ত আপনার শক্ত্যনুযায়ী উপহারাসাদন করিয়া মাকে যেখানে ডাকে, সেইখানেই আবির্ভূতা হইয়া তিনি সেই উপহারই গ্রহণ করিয়া থাকেন! অতএব, বৎস! তোমার অর্থ সম্বল নাই বলিয়া বিষণ্ণ হইও না। তজ্জন্য তোমার মায়ের পূজা বা আবির্ভাবের কোন বাধা হইবে না। তুমি ভিক্ষাদির দ্বারা যে কিছু সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহাই মায়ের পূজার পর্য্যাপ্ত উপহার হইতে পারিবে, কিন্তু তৎ সমস্তই ভক্তি-সুধার দ্বারা প্রক্ষিত হওয়া আবশ্যক।

তারাপদ।—ভগবন্! আপনার উপদিষ্ট আখ্যান চতুষ্টয় শ্রবণ করিয়া, আমার মায়ের আসার আশা একেবারেই নির্ব্বাপিতা হইল! আমি ভ্রান্ত হইয়া বামনের চন্দ্র গ্রহণ স্পৃহার ন্যায় ত্রিলোকেশ্বরীর চরণ-দর্শনের স্পৃহা করিতেছিলাম। দুর্গাশরণ, ভোলাদাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যাঁহার কৃপা-লাভের নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, আমি তাঁহার আশা করিব কিরূপে? কেমন করিয়া তাঁহার কৃপাভাজন হইব? আমার তো ভক্তিশ্রদ্ধা কিছুই নাই, ব্যগ্রতা সহকারে ডাকিতেও জানি না, যথাবিহিত অর্চ্চনাও জানি না, তবে কোন্ সাহসে তাঁহার কৃপার আশা করিব? কিন্তু, দেব! এ সমস্ত বুঝিয়াও আমার পুরোভাগী হৃদয় সেই পূজার আশা উপেক্ষা করিতেছে না। আপনার প্রথমোক্ত দুর্গাশরণ মহাশয়ের উপাখ্যানের দ্বারাই মায়ের আগমনের আশা বিশুষ্ক হইয়াছে। কিন্তু পূজার আশা কিছুতেই বিনষ্ট হইল না। অতএব,

এখন কি উপায়ে ইহা উপেক্ষা করিতে পারি, তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দিন, নতুবা কোনমতেই আমি শান্তি পাইতেছি না।

গুরুদেব।—বৎস ভয় নাই, হতাশ্বাস হইও না! তুমি মাকে আনিতে পারিবে, তুমি মায়ের প্রিয় পুত্র, মা তোমার আহ্বান উপেক্ষা করিবেন না; অতএব, তুমি যথাশক্তি পূজার আয়োজন কর।

তারাপদ।—ভগবন্! আপনার আজ্ঞাই আমার বরাভয়প্রদ বটে, কিন্তু তথাপি আমার ভাগ্যের প্রতিকূলতায় পাছে এই মহাবাক্যে কলঙ্ক স্পর্শ করে—এই আশঙ্কা করিয়া কিছু কুণ্ঠিত হইতেছি। যাহা হউক, এই আজ্ঞাই শিরোধার্য্য করিলাম।

এই বলিয়া, গুরুদেবের চরণোপান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক তারাপদ নিজের আশ্রমের প্রতি প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

তারাপদের দুর্গোৎসব।

গুরুদেবের আজ্ঞা গ্রহণে নিজ কুটীরে প্রত্যাগত হইয়া তারাপদ ভট্টাচার্য্য বিষণ্ণ ভাবে মনে মনে চিন্তা করিতেছেন।—

তারাপদ।—আমি কি করিলাম, একি সিকতার পুরী নির্ম্মাণ করিলাম! আমি কিসের উপরি নির্ভর করিয়া মায়ের পূজার আশা করিতেছি, আমার কি আছে? ভক্তিশ্রদ্ধা তো নাই, তৎপর অতি

দরিদ্রের ভাবেও যে কিছু উপহারাদি আবশ্যক, তাহাই বা আমি কোথায় পাইব ? এখন যে, আমার দিন যাত্রা নির্ব্বাহেই কৃচ্ছ্রতা হইতেছে! ভিক্ষালম্বন করিলে তাহাও তো সন্নিহিত গ্রাম সমূহে সম্ভাব্য নহে। এখানে যে দিনযাত্রার জন্যই অনেক সময়ে উপস্থিত হইতে হয়। এখন আবার একার্য্যের নিমিত্ত গেলে তাঁহারা কি মনে করিবেন? তাঁহারা তো আমার ব্যাকুলতার উপলব্ধি করিবেন না! আর অন্যত্রই বা কোথায় যাইব, আমিত কখনো কুত্রাপি যাই নাই, কাহাকেও চিনিও না, জানিও না! তবে কেমন করিয়া কি হইবে, কেমন করিয়া আমার দুরাশার সফলতা হইবে!

এইরূপ নানাবিধ দুশ্চিন্তা করিতে করিতে, তারাপদ অতি দুর্ম্মণা হইয়া মুহুর্ম্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস করিত্যাগ করিতেছেন, এই সময়ে তাঁহার মাতুল দুর্গানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাগিনেয়ের সন্দর্শনার্থে সমাগত হইলেন, এবং তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দর্শনে বিষণ্ণ হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তারাপদও মাতুলের যথা-বিধি সৎকার পূর্ব্বক সমস্ত আবেদন করিলেন। অনন্তর দুর্গানন্দ, প্রিয় ভাগিনেয়ের দুঃখ নিবারণার্থে এইরূপ উপায় অবধারণ করিয়া বলিতে লগিলেন।—

দুর্গানন্দ।—বাবা! তুমি যাহা বলিলে, তৎ সমস্তই সত্য। সন্নিহিত গ্রাম হইতে, এবিষয়ে তোমার বিশেষ কোন আনুকূল্য পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা যথার্থ; আবার আজকাল যেরূপ দিনকাল উপস্থিত, তাহাতে কোন নগর নগরী হইতেও বিশেষ কিছু হয়, এমত ভরসা হইতেছে না। তবে নবভূম নগরে অবল-তারণবাবু নামে একটি ধনাঢ্য ধার্ম্মিক লোক আছেন, তাঁহার

নিকট কিঞ্চিৎ আশা হইতেছে। তিনি অনেককেই এ সকল সৎ কার্য্যের আনুকূল্য করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহার নিকটে একবার গিয়া দেখ। বোধ হয়, তোমার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলে, তিনিই তোমার আশা পূর্ণ করিবেন। অতএব দুশ্চিন্তা পরিহার করিয়া, এখন এই উপায়েরই অনুসরণ কর।

এই বলিয়া দুর্গানন্দ প্রস্থান করিলেন। তারাপদও মাতুলের উপদেশই হিতকর বিবেচনা করিয়া অবল-তারণ বাবুর অন্বেষণে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তারাপদ, আর কখনো এখানে আইসেন নাই, অবল বাবুকেও চিনেন না, সুতরাং তত্রত্য লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর জনৈক সাধারণ লোক, ভ্রান্ত হইয়া, অবল-তারণ বাবুর পরিবর্ত্তে, তাঁহাকে "অবলাতারণ" বাবুর বাড়ী দেখাইয়া দিল। তারাপদও "অবলার" "আ" কারের প্রতি অভিনিবেশ না করিয়া "অবল-তারণ" ভ্রমে সেই সর্ব্বধর্ম্ম-বহিস্কৃত, নবশিক্ষোন্মত্ত, উকীল অবলাতারণের বাড়ীতেই প্রবেশ করিয়া, তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। এদিকে অবলা বাবু নব্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া চতুষ্পাদিকায় বসিয়া তাম্রকূটবর্ত্তিকা টানিতেছেন, এবং ভারতের পুরাতন রীতিনীতি, ধর্ম্মকর্ম্ম এবং পরিচ্ছদাদির অসভ্যতা চিন্তা করিয়া, অন্তর্জ্জ্বালায় দগ্ধ হইতেছেন! এই সময়ে আবার সেই প্রাচীন বেশধারী প্রাচীন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত! সুতরাং তখন তিনি দ্বিগুণ ক্রোধে জ্বলিত হইয়া, এইরূপ বলিতে লাগিলেন।—

অবলা বাবু।—তুমি কে? কিজন্য এখানে আসিলে? কাহার অনুমতিতে এ বাড়ীতে প্রবেশ করিলে?

তারাপদ।—মহাত্মন্! আমি জনৈক ব্রাহ্মণ, ভিক্ষার্থী হইয়া আপনার সমীপে সমাগত।

অবলা বাবু।—তুমি জান, যে, অনভিমতে কাহারো বাড়ীতে প্রবেশ করিলে, কিম্বা কাহাকেও বিরক্ত করিলে, অপরাধী হয়?

তারাপদ।—হাঁ, তা জানি, কিন্তু আমি কোন অপরাধের ভাবে আসি নাই। শুনিয়াছি আপনার নিকট সততই, দুঃখী দরিদ্র এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সমাগম হইয়া থাকে। তাই আমিও আগমন করিয়াছি।

অবলা বাবু।—(ক্রোধে বেপমান হইয়া) আ—রে। কে আছিস্? একটা কনষ্টেবল সহ সব্ ইন্স্পেক্টার বাবুকে নিয়া আয় তো। আর এই জুওচোর বামনকে আট্কাইয়া রাখ্।

এই বলিয়া অমনি, অনধিকার প্রবেশ এবং শান্তি-ভঙ্গের অপরাধ-সম্বলিত অভিযোগ-পত্র লিখিতে বসিলেন। তখন তারাপদ এই সকল ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে নানারূপ জল্পনা করিতে লাগিলেন।—

তারাপদ।—এ কি দেখিতেছি! কি শুনিতেছি! মাতুল মহাশয় কি বলিলেন, আর ইহাই বা কি, এখন কি পুলিশে যাইতে হইবে! হউক, দেখা যাউক, ঘটনা কতদূর দাঁড়ায়। আমি ত বাস্তবিক কোন অপরাধী নহি, তবে আর ন্যায়বান্ গবর্ণমেণ্টের নিকটই বা আমার ভয় কি!

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, পুলিশ রমণী বাবু উপস্থিত হইলেন এবং বাদী অবলা বাবুর অভিযোগ গ্রহণ করিয়া তারাপদের উত্তরও শুনিলেন। কিন্তু হইলে কি হইবে? তিনি ত গবর্ণমেণ্ট নহেন, ইংরাজও নহেন। তিনি সেই অবলা বাবুর বন্ধু, রমণীবাবু;

সুতরাং তারাপদ তাঁহার নিকট নিস্তার পাইতে পারিলেন না। তিনি তারাপদকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান করিলেন। কিন্তু তারাপদের দুর্ভাগ্য, ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং এই অভিযোগ রাখিলেন না, তিনিও ডেপুটি কামিনীদাস বাবুর হস্তে ইহার বিচার ভার অর্পিত করিলেন। কামিনীদাস অবলা-তারণ অপেক্ষাও অধিক তেজস্বী এবং স্বাধীন, পুরুষ, সুতরাং তিনিও দণ্ডবিধির গুণ্ডীর মধ্যে থাকিতে কষ্ট বোধ করেন। অতএব, তিনি তিন দিন পর, বিচারের দিন স্থির করিয়া, বিবাদীকে ৫০ টাকার প্রতি-নিধির (জামিনের) দ্বারা উপস্থিত থাকা, আর তাহা না হইলে, কারালয়ে (হাজতে) থাকা, আদেশ করিলেন। তখন তারাপদ সেই কঠোর আদেশ শুনিয়া কিছুকাল স্তব্ধবৎ রহিলেন, তৎপর অর্থাদির অভাবে তাঁহার প্রতিনিধি দেওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া, সদাই বিচার নিষ্পত্তির জন্য অনেক প্রকার বলিলেন, কিন্তু বিচারক তাহা গ্রহণ করিলেন না, সুতরাং তাঁহার কারালয়ে থাকাই স্থির হইল। অনন্তর তারাপদ মহাশয় নিজের অদৃষ্ট ও বর্ত্তমান অচিন্তিত-পূর্ব্ব দুষ্পরিণাম উপলব্ধি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে, রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক কারালয়ে নীত হইলেন !

কারালয়ে পূজাহ্নিকাদি অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা নাই, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণোচিত আহারও ঘটে না, সুতরাং সেই অকৃত সন্ধ্যাহ্নিক, এবং অনাহারাবস্থায়ই তারাপদের দিন অতীত হইতে লাগিল। ক্রমে রজনী উপস্থিতা হইলেন। অন্যান্য অপরাধিগণ নিজ নিজ স্থানে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইল, তখন একাকী তারাপদ এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলেন।—

তারাপদ।—হায়! এ কি হইল! কোন্ চিত্র উপস্থিত হইল! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না, মৃত হইয়া প্রেতরাজ্য দর্শন করিতেছি, অথবা জাগ্রত থাকিয়াই কারাবাস ভোগ করিতেছি! আমার ইহা হইল কেন? আমিত এজন্মে কথনো কোন পাপানুষ্ঠান করি নাই! অথবা আমি যে ভক্তি-শ্রদ্ধা বিহীন হইয়াও সেই ত্রিলোকেশ্বরীর আগমনাশা এবং পূজানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম!—ইহাই কি মহাপাপ? তাহারই কি এই দুষ্পরিণাম? আমি ইহা করিলাম কেন, কেনই বা দুরাশয় অবল-তারণের নিকট আসিলাম! এখন যে জীবিত থাকিয়াই মৃত্যুরাজ্য দর্শন করিতেছি! অতঃপর বিচার হইলে, আরও কি হয়, তাহারই বা নিশ্চয় কি! হউক, আমি যেরূপ পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, তাহাতে এইরূপ দণ্ড হওয়াই উচিৎ; ইহাতে আমার দুঃখ করা উচিত নহে। কিন্তু মায়ের দৈনন্দিন আরাধনা যে বাধিত হইল, এই যন্ত্রণা কিছুতেই সহ্য হইতেছে না!

এইরূপ নানাবিধ জল্পনা ও ভাবনা চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি অতীতা হইল। অপর দু দিনও ক্রমে ঐ অবস্থায়ই অতিক্রান্ত হইল। আজ তারাপদের বিচারের দিন। এদিকে তারাপদের আদেশমতে বাড়ীতে একখানি প্রতিমা নির্ম্মাণ করান হইয়াছে, এবং অর্থ-ব্যতীত যে যে আয়োজন হইতে পারে, তাহাও সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু অর্থ-সাধ্য কোন কিছুই হইতে পারে নাই। ক্রমে আজ অধিবাসের পূর্ব্ব দিন উপস্থিত। পরিবারবর্গ তারাপদের পথ নিরীক্ষণে কালাতিপাত করিতেছেন।

অপর দিকে, বেলা দশ ঘটিকার পর, কামিনী-দাসের বিচারালয়ে তারাপদের ডাক হইল, এবং উপস্থিতির পর তাঁহার উত্তর

চাওয়া হইল। তখন তিনি যথাবৎ সমস্ত আবেদন করিলেন, কিন্তু কামিনী বাবু ক্ষমার্হ হইতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার একমাস কারাদণ্ড আদেশ করিলেন। তখন সেই দারুণ বাক্য শ্রবণে পঞ্চদিনের অনাহারী তারাপদ, মূর্চ্ছিতবৎ হইলেন। তাঁহার উপবাস-প্রক্ষীণ ইন্দ্রিয়গুলি নির্জীব হইয়া পড়িল! তখন তিনি চলৎ-শক্তি-রহিত হইয়া ভূমির আশ্রয় লইলেন। অনন্তর রাজপুরুষগণ তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া কারাগারে লইয়া গেল এবং কারাবাসীর পরিচ্ছদে বিড়ম্বিত করিল। তাঁহার সেই সুদীর্ঘ বাহুদণ্ডে লৌহ বলয়, কণ্ঠে কারাবাসি-সংখ্যাঙ্ক কাষ্ঠ-পদক এবং কটিতে জঙ্ঘাবরণ পরাইল, আর শয়নের জন্য কম্বল এবং উপাধানে ইষ্টক ব্যবস্থা করিল। তারাপদ এইরূপ পরিচ্ছদে সমাবৃত হইয়া, না জীবিত, না মৃত, এই অবস্থায় দিনটুকু অতীত করিলেন, ক্রমে রাত্র্যাগম হইয়া সকলে নিদ্রিত হইলে, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।—

তারাপদ।—পাপ-জীবন! তোমার কি এইরূপ পরিণাম নির্ব্বন্ধ ছিল! তুমি কি এতই দুষ্কর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছিলে! আজ মুক্তি পাইব বলিয়া, পঞ্চ দিবস পর্য্যন্ত সন্ধ্যাপূজা-বর্জ্জিত হইয়া অনাহারে ছিলাম, কিন্তু তাহাতে তোমার দুষ্কর্ম্ম-বিপাকের শেষ হইল না! আজ আবার আরো একমাসের জন্য এই পিশাচত্ব-ভোগের ব্যবস্থা হইল! এখন তো আর জীবিত থাকার সম্ভাবনা নাই! এখন তো তুমি অপমৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতেছ! মাগো! জগজ্জননি! তোর কি ইহাই ইচ্ছা ছিল! ইহাই কি আমার শেষ পরিণাম স্থির করিয়াছিলি! মাগো! আমার ভক্তিশ্রদ্ধা কিছুই নাই, তাহা সত্য। তোর চরণোপান্তে শত সহস্র অপরাধ করি-

য়াছি, তাহাও মিথ্যা নহে। কিন্তু তাই বলিয়া, তোর অব্যাহত নাম-মহিমাও কি লুক্কায়িত হইল! মাগো! দুর্গতিহরে! তোর দুর্গা-নামে ভব-বন্ধন মুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু দুর্ভাগ্য তারাপদের পক্ষে কি তাহাই কারাবন্ধনের হেতু হইয়া উঠিল! হউক, তোর যদি ইহাই ইচ্ছা থাকে, তবে হউক। কিন্তু আজ পাঁচ দিবস যাবৎ যে তোর ঐ চরণ-যুগলে একটি জলাঞ্জলিও দিতে পারিতেছি না, ইহাই অসহ্য যন্ত্রণাবহ হইয়া উঠিয়াছে। মাগো! এই পঞ্চ দিনের অনাহার-ব্যসন অপেক্ষায়, এই নরক-ভোগ অপেক্ষায়, এই যন্ত্রণাই আমার অধিকতর ঘনীভূত হইয়া উঠিযাছে! তৎপর, এই কয়েক দিন তোর ঐ চরণ দুখানি মনের মধ্যেও রাখিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু আজ তাহাও ঘটিতেছে না! অনাহার-ব্যসনে সর্ব্বেন্দ্রিয়-শৈথিল্য হইয়া, মনও আমার অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। মাগো! আজ আমার বাহ্যাভ্যন্তর দুই দিকেই অন্ধকার, আজ অন্তর হইতেও তোকে হারাইয়াছি, দুই দিকই আজ শূন্যময় হইল! মাগো! ওমা! এই দেখ, আমার দর্শন-শক্তি অস্ফুট দর্শন করিতেছে, শ্রবণ শক্তিও কোন কিছুই শুনিতেছে না, নিশ্বাস-বায়ু নিরুদ্ধবৎ হইয়া আসিয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া মনও যেন শূন্যরাজ্যে মগ্ন হইতেছে! মাগো! আর তোকে দেখিতে পাইলাম না, আর তোকে ভাবিতে পাইলাম না! মাগো! হতভাগ্যের কণ্ঠও অবরুদ্ধ হইল! প্রাণ ভরিয়া আর ডাকিতেও পারিলাম না। মাগো! ওমা! মা!—

এই বলিতে বলিতে, তারাপদ মূর্চ্ছিত হইয়া নিপতিত হইলেন। তখন কৈলাস-বিহারিণী করুণাময়ীর করুণা-সাগর তরঙ্গায়িত হইয়া, তাঁহার স্নেহভরা হৃদয়টিকে বিচলিত করিল। মা আর

স্থিরা থাকিতে পারিলেন না। তখন প্রিয় সেবক বীরভদ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বৎস! দুরাচার অবলাতারণ আর কামিনীদাস, আমার প্রিয়তনয় তারাপদকে, কারাবাসে আবদ্ধ করিয়াছে, তাহার ক্লেশানুভব করিয়া আমি অধীরা হইতেছি! অতএব, তুমি এখনই সেই পাপাশয়-দ্বয়ের নিকট গিয়া তারাপদের মুক্তি ব্যবস্থা কর, আর যাহাতে তাহার পূজা হইতে পারে, তাহাও করিয়া আসিবে।" এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং, সেই মূর্চ্ছিত অবস্থাতেই তারাপদ-সন্নিধানে উপনীত হইয়া, বলিতে লাগিলেন। "বাবা! ভয় নাই, শান্ত হও, গাত্রোত্থান কর, রজনী প্রভাতেই তোমার সমস্ত যন্ত্রণা বিদূরিতা হইবে; তোমার চিরাভিলাষ পরিপূরণ হইবে; আমি তোমার কুটীরে গিয়া অর্চ্চনা অঙ্গীকার করিব"—এই বলিয়া মা অন্তর্হিতা হইলেন। তারাপদও, ঐরূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়া, উহা সত্য সত্যই মায়ের কথা, অথবা তাঁহার চিত্ত-বিভ্রমের বিজৃম্ভণ মাত্র! এইরূপ নানাবিধি জল্পনা কল্পনা করিতে করিতে রজনী অতিবাহিতা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে, অবলাতারণ এবং ডেপুটি কামিনী বাবু, উভয়েই প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় যুগপৎ এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিতেছেন।—তাঁহারা দেখিতেছেন, যেন কালান্তক যমের ন্যায় এক বিকট বিরাট পুরুষ আসিয়া, ঘোর দংষ্ট্রা-করাল-মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সপরিবারে সবান্ধকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, আর বিকট নয়নে বিকট স্বরে বলিতেছে, "অরে! পাপাত্মন্! নর-পিশাচ! তোমরা সম্পদ-মদে অন্ধ হইয়া ত্রিলোকেশ্বরীর প্রিয়তনয় নিরপরাধী তারাপদ মহাশয়কে কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছ! এই রাত্রি মধ্যে তাঁহাকে বিমুক্ত কর

সবান্ধবে পদানত হইয়া, প্রত্যেকে দ্বিশত মুদ্রার দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা কর। নচেৎ এখনই তাহার প্রতিবিধান করিব।"

এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া, উভয়েই বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং স্তম্ভ-নিবদ্ধ ছাগের ন্যায় থর থর কম্পিত হইতে লাগিলেন! তখন সেই চীৎকার শ্রবণে, উভয়েরই বাড়ীর অন্যান্য সকলে জাগ্রত হইয়া "কি হইল! কি হইল"! বলিয়া, নিকটে উপস্থিত হইল এবং সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল! তখন ভয়-বিহ্বল অবলাতারণ, কি উপায়ে রাত্রি-মধ্যে স্বপ্নাদেশ পালন করা হইবে, ইহার পরামর্শ করিতেছেন। এদিকে কামিনী-দাসও অনন্যোপায় হইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে অবলাতারণের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন, এখানেও সেই তাঁহার মত স্বপ্ন দেখিয়াই অবলাতারণ বিপন্ন হইয়াছেন! তখন নিজের বিপদের বিষয়ও বিজ্ঞাপিত করিয়া, অনুষ্ঠিত দুষ্কর্ম্মের শান্তির নিমিত্ত উভয়েই একজন উকীলের নিকট গেলেন, এবং সমস্ত ঘটনা জানাইলেন! অনন্তর তাঁহাকেই তারাপদের প্রতিনিধি (জামিন) স্থির করিয়া, সেই রাত্রিতেই জজ বাহাদুরের নিকট গিয়া, তারাপদের আপীল উপস্থিত করা এবং তাঁহাকে প্রতিনিধি দিয়া মুক্ত থাকার প্রার্থনা করার অনুরোধ করিলেন। উকীল বাবুও ইহাঁদের উভয়ের বিপদ আর সাধু তারাপদের অসঙ্গত ক্লেশ নিবারণের নিমিত্ত, সেই রাত্রিতেই সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া তারাপদকে বিমুক্ত করিলেন।

অনন্তর অবলাতারণ এবং কামিনীদাস উভয়েই সপরিবারে তারাপদের পদ-লুণ্ঠিত হইলেন এবং ভয়ে ম্রিয়মাণ হইয়া প্রত্যেকে [illegible]ক রজত মুদ্রা সমর্পণ করিয়া যেন পুনর্জ্জীবিত হইলেন।

তখন-তারাপদ, হঠাৎ সেই কারাগারমুক্তি এবং চতুঃশত মুদ্রা-লাভ করিয়া পরমানন্দে স্নানাহ্নিকাদি সমাধা করিলেন। অনন্তর সেই নগরী হইতেই মায়ের পূজার বস্ত্রালঙ্কারাদি সমস্ত উপহার সংগ্রহ করিয়া অধিবাসের রাত্রিতে নিজাশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন এবং বন্ধুবান্ধব সমবেত হইয়া পরমানন্দে পরমোৎসাহে সমস্ত শক্তি, সমস্ত অর্থের দ্বারা মায়ের পূজোৎসব সম্পন্ন করিলেন। ত্রিলোকজননী করুণাময়ী মাও, সেই প্রতিমায় অধিষ্ঠিতা হইয়া, তারাপদের ভক্তি-সম্বলিত আরাধনা অঙ্গীকার করিলেন। এদিকে, যথাসময়ে ন্যায়বান্ জজ বাহাদুরও তারাপদের কারাদণ্ডের নিষেধাজ্ঞা করিলেন। এ বার, এই ভাবে তারাপদের দুর্গোৎসব পরিসমাপ্ত হইল।

ইতি শ্রীশশধর-তর্কচূড়ামণি-বিরচিতা ভক্তিসুধালহরী সমাপ্তা। শক ১৮১৭। ১লা ভাদ্র।